বিশ্বধর্ম ও বিশ্বনবী

মৌঃ মোহাম্মাদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

প্রকাশক :

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী, প্রকাশনা ও প্রণয়ন
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড—ঢাকা

১ম সংস্করণ :
মার্চ ১৯৮০ইং

মুদ্রাকর :

আল-হাজ্জ মোঃ আবদুস সালাম
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে খ্রীষ্টধর্মের বহুমুখী প্রচার ব্যবস্থার সম্মুখে এদেশের মুসলমান লেখক সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করিতেছিলেন এবং মুসলিম জনসাধারণ একান্ত অসহায় বোধ করিতেছিল।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কাহারও তেমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা নাই। তেমনি খৃষ্টধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধেও লোকের জ্ঞান কম।

সত্যকে জগতের সম্মুখে পেশ করা একান্ত কর্তব্য। বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে গত ১৪/১০/৭৯ এবং ১৪/১২/৭৯ তারিখে "সুসমাচার—শান্তি" এবং "বিশ্বধর্ম ও বিশ্বনবী" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২৫।১২।৭৯ তারিখে "মরিয়ম পুত্র যীশু" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জনগণের উপকারার্থে এখন রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা, তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি দান করুন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য অনুধাবন করিয়া উহাকে গ্রহণ করার এবং উহার উপর সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন। সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার।

সেক্রেটারী
তালিফ ও তসনিফ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃঃ
১। ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের পটভূমি	১
২। বিশ্বধর্ম ও বিশ্বনবী	১৪
৩। মরিয়ম পুত্র যীশু	৪৪
৪। একটি ভবিষ্যদ্বাণী	৬৪

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের পটভূমি

বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচারকল্পে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য বহু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আবির্ভূত হন 'ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ' রূপে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ ইসাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুক্রবার প্রভাতে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত বাটালা মহকুমার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ মির্যা হাদী বেগ পারশ্য রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাদশাহ বাবরের রাজত্বকালে সমরকন্দ হইতে হিজরত করিয়া যে স্থানে বসবাস করেন তাহাই উত্তরকালে কাদিয়ান নামে পরিচিত হয়। তিনি বাদশাহের দরবার হইতে বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রাপ্ত হন। ৮৫টি গ্রাম ঐ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ ইসাব্দে আল্লাহ-তায়ালার নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হওয়ার ঘোষণা করেন এবং ১৮৯১ ইসাব্দে মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা হইবার দাবী করেন। তাঁহার দাবীর সত্যতার

স্বপক্ষে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস হইতে এবং বাইবেল (তৌরাত, ইঞ্জিল) ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হইতে অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য জ্বলন্ত ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সময়ের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার আবির্ভাবের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছে। তাঁহার পবিত্র নিষ্কলুষ, জীবন, তাঁহার জন্য আল্লাহতায়ালার বিশেষ সাহায্য, তাঁহার ঐশী জ্ঞান, তাঁহার কবুলিয়াতে-দোওয়া, তাঁহার সংগঠন এবং রুহানী নেতৃত্ব, তাঁহার শত্রুগণের পরিণাম, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের যথাসময়ে পূর্ণতা-লাভ ইত্যাদি বিষয়ে হাজার হাজার প্রমাণ তাঁহার ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসিহ হওয়ার দাবীকে মোহরাঙ্কিত করিয়াছে।

আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় তিনি ছোট-বড় প্রায় ৯০ খানা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই সকল পুস্তকের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে আল্লাহতায়ালা এবং ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র রসুল সাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে বিশ্বব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচারের জন্য যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও কার্যকরী ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল বই-পুস্তক ছাড়াও তিনি জীবনে ৯০ হাজার চিঠি-পত্র লিখেন এবং পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাঁহাকে গ্রহণ করার জন্য নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী দাওয়াতী পত্রও লিখেন। এই সকল চিঠির সংখ্যা ১৬ হাজার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইসলাম-ধর্মকে, জর্জরিত এবং অসহায় অবস্থায় দেখিতে পান। তখন ইসলাম ধর্মের উপর এক-দিকে সর্বজাতির দিক হইতে প্রবল বহিরাক্রমণ হইতেছিল এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণভাবে নানা দুর্বলতা এবং কুসংস্কার দেখা দিয়াছিল। ইসলামের উপর প্রকাশ্য বহিরাক্রমণে বিশেষতঃ খ্রীষ্টানরা উহাকে ধ্বংস করার জন্য কিরূপ সংঘাতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিম্নের একটি উদ্ধৃতি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে :

"I might sketch Christian movement in Mussalman lands which has touched, with the radiance of the cross the Lebanon and the Persian mountains as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day when Cairo and Damascus and Teheran shall be the Servants of Jesus and when even the solitudes af Arabia shall be pierced and Christ in the person of his disciples shall enter the Kaba of Mecca and the whole truth shall at last be there spoken."

[Lectures on 'Christianity – The worldwide Religion, 1996-97 by John Henry Burrows. Page – 42]

আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া অবস্থা এইরূপ ছিল যে, প্রকৃত তৌহীদের স্থলে অসংখ্য প্রকারের শেরেক ও বেদাতের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পুণ্য কাজের স্থলে সামাজিক বহু কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করিতেছিল। পীর পূজা ও কবর পূজা এতদূর বাড়িয়াছিল যে, উহা একটা নূতন শরীয়তের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সত্যিকার তাকওয়া ও অন্তরের সুচিতা ইসলামের মূল লক্ষ্য। কিন্তু কালক্রমে এইগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ, পর্দাহীনতা, চরিত্রহীনতা, অনাচার, শঠতা ইত্যাদির আলোচনা করিলে একখানা বৃহৎ পুস্তক লেখা যাইবে। কালক্রমে মুসলমানগণ ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের গদ্দীনশীন উত্তর পুরুষগণ এবং অন্যান্য দল-নেতাগণ উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শতধাবিভক্ত করিয়া কুফুরী ফতোয়ার তরবারী দিয়া একদল অন্যদলকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া ইসলামের ঘরকে খালি করিয়া দিল। বলা বাহুল্য যে ইসলামী খেলাফতের চির প্রতিশ্রুত রজ্জু হইতে পর্যায়ক্রমে স্খলিত হওয়ার ফলে মুসলিম ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট হইয়া যায়। এমন একদিন ছিল যখন সকল জাতি ইসলামের মহান শিক্ষা ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও আদর্শে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তথা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামের উপর এমন এক অমানিশা নামিয়া আসিয়াছিল, যখন অধিকাংশ মুসলমান রাজ্য-হারা, স্বাধীনতা-হারা পরাধীন জীবন যাপন

করিতেছিল—অন্যদিকে অসংখ্য মুসলমান বিজাতীয় প্রচার তৎপরতার এবং অন্যান্য প্রলোভনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। অনেকে নিরাশ হইয়া নাস্তিক হইয়া যায়। অথবা খৃষ্টান ও শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে খৃষ্ট-ধর্ম বা হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করে। ঐ সময় প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হইয়া যায়—তাহাদের মধ্যে খৃষ্টান সিরাজউদ্দীন, এমাদুদ্দীন, সফর আলী, শায়েক প্রমুখ আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যাহারা খৃষ্টান-ধর্ম গ্রহণই করেন নাই বরং ইসলাম-বিরোধী প্রচার কার্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য আলেমগণ নির্বিকার চিত্তে এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপন কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করেন।

এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন ঃ "এই সকল দুরাবস্থা যখন দেখি বা শুনি, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার মনে বড় আঘাত লাগে। আজ ইসলাম এমন দুরাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে এবং মুসলমান সন্তানদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ইসলামকে তাহাদের রুচী-বিরুদ্ধ মনে করিতেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ইসলামী বিধি-নিষেধের বাহিরে যাইয়া হালালকে হারাম করে নাই বটে ; কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।"
[হযরত মির্যা গোলাম (আঃ) প্রণীত "তবলীগে হক" পৃঃ-৯]।

ইসলামের ভিতরের অবস্থা এবং ইসলামের বাহিরের শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণ সত্বেও ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি কি

অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে? আপাতঃদৃষ্টিতে উদ্ধারের কোন পথ দেখা যাইতেছিল না। আভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দলে, বাহ্যিক শত্রুদের আক্রমণে, নাস্তিকতার গরল নিশ্বাসে এবং বস্তুবাদী মতবাদগুলোর নির্মম নিষ্পেষণে যখন পৃথিবীতে এক মহা-অমানিশার কালছায়া নামিয়া আসিয়াছিল, যখন দাজ্জাল (ভ্রান্ত খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ) ও ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিসমূহ তাহাদের রাষ্ট্র শক্তি ও প্রতিপত্তির সাহায্যে মহা-ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করিতেছিল, যখন 'মুসলমান দর গোর ও মুসলমানী দর কেতাব' অর্থাৎ 'সত্যিকার মুসলমানগণ ছিল গোরে এবং মুসলমানী ছিল কেতাবে,' ঠিক সেই সময়ে—সেই মহা-প্রতিশ্রুত সময়ে—আল্লাহতা'লা মুহাম্মদী উম্মতের বাহির হইতে নহে বরং মোহাম্মদী উম্মতের মধ্য হইতেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি আল্লাহত'লার নির্দেশে ইসলামের পূর্ণ-প্রচার কল্পে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করিলেন এবং তাঁহার কথা, কাজ-কর্ম, লেখনী এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার জলন্ত ও জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন তিনি বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিলেন যে, 'সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর যেমন পুনরায় সে মাতৃগর্ভে ফিরিয়া যাইতে পারে না, তেমনিভাবে প্রগতির ধারায় ধর্ম ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করিয়া, উহা খ্রীষ্ট-ধর্মে ফিরিয়া যাইবে না। যীশু-খ্রীষ্ট স্বয়ং অথবা খ্রীষ্টধর্মের কোন ব্যক্তি আসিয়া ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচার করিতে পারিবে না।'

তিনি ঘোষণা করিলেন 'ইসলাম ধর্মই জগতে বিজয়ী হইবে—ইহা আল্লাহতা'লার 'চিঠিলিপি'—এই মহান বাণীই তিনি আনিয়াছেন এবং ইহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা করাই ছিল তাঁহার কাজ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

"ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা, না কিসি আওর কা ওয়াক্ত।
ম্যাঁয় না আতা তো কোয়ী আওরহি আয়া হোতা।"

অর্থ—"ইহাই প্রতিশ্রুত মসীহের যামানা, অন্য কাহারও যামানা নহে।

যদি আমি না আসিতাম তাহা হইলে অন্য কেহ আসিত।" অজানা অচেনা একটি স্থান হইতে অসহায়-সম্বলহীন একব্যক্তি হিসাবে তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি একটি কলম লইয়া বিভিন্ন ধর্মের শক্তিশালী দুর্মুখ পণ্ডিত-পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণের বিরুদ্ধে ইসলামের বিশ্বজয়ী ঘোষণাসহ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার লেখনীর আঁচড়ে আঁচড়ে জ্ঞান, যুক্তি ও শক্তির অপূর্ব ঝলক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তিনি উম্মী স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য ও লেখনীর সম্মুখে সকলে নির্বাক হইয়া গেল। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কলম শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মুসলমানদের ধর্মত্যাগী হওয়ার স্রোত থামিয়া গেল। সত্যান্বেষীর চোখে সত্যের জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল এবং হৃদয়ে ঈমানের প্রবাহ উৎসরিত হইল। মুসলমান তার হারানো ঈমান ও আমল ফিরিয়া পাইল এবং বহু অমুসলমান আবার মুসলমান হইতে লাগিল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রবল যুক্তি ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা খণ্ডন করিলেন এবং ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ইসলামের জীবন্ত ও সক্রিয় খেলাফতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কার্যকরী কর্মপন্থা সম্বলিত সৎকর্মশীলদের একটি জামাত গঠন করিয়া ইসলামের মহা-প্রতিশ্রুত বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীষ-মণ্ডিত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের এক মহা-কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ ভাবে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করিয়া সম্মুখের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যবাসী, যাহারা আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের মানুষকে বিপথগামী করিতেছিল— আজ তাহাদের মোকাবেলায় আহমদী মুবাল্লিগগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের গৃহে ইসলামের আশীষধারা বণ্টন-কার্যে নিমগ্ন হইয়াছেন। প্রত্যেক আহমদী আজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানকে জীবনের বিনিময়েও সতর্ক প্রহরীর ন্যায় সংরক্ষণ করিতে হইবে। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বিশ্ব-নবী রূপে এবং সারা বিশ্বকে তাঁহার রহমতের ছায়াতলে এক মণ্ডলীভুক্ত করার মহান আদর্শ ও বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার মহা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এবং সদা প্রস্তুত। আহমদীয়া

জামাত শান্তি ও যুক্তিপূর্ণ পথে ও পদ্ধতিতে যে বাস্তব কর্ম-প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহারই মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় মানুষের হৃদয়ে, মানুষের ধ্যান-ধারণা ও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং তাহার ফলে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম সমস্ত জগতকে ছাইয়া ফেলিবে।

ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে সকল কাজ করিয়াছেন তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল :

১। দুনিয়ায় নবীর আগমণ হয় আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করিতে এবং তাঁহার সহিত প্রত্যেক মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ কায়েম করিতে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধে চরম ও পরম নিশ্চয়তাপূর্ণ জ্ঞান দিতে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে মুসলমানগণ উহা হারাইয়া ফেলে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া সেই হারানো কল্যাণ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাস ও এই যুগে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারই মাধ্যমে আজ উক্ত কল্যাণ লাভের দ্বার খুলিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য শক্ত আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ইমাম মাহদীকে আমার সালাম পেঁছাইবে এবং তাঁহাকে

গ্রহণ করিবার জন্য বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইলেও তাহা করিবে।

২। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, যাহার চন্দ্রাতপতলে আল্লাহ্-তায়ালা বিশ্ব-মানবকে একত্রিত করিতে চাহেন, এক নযীর বিহীন কল্যাণ যাহা মুসলমানগণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আসিয়া সেই বিশ্ব-জোড়া মানব ভ্রাতৃত্বের শীশাগলীত প্রাচীরের ন্যায় এক মজবুত জামাত গঠন করিয়াছেন। দিনে দিনে ও দলে দলে সত্যানুসন্ধি জনগণ এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাবাসী ও দ্বীপবাসীগণ যোগদান করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান অনুযায়ী সমগ্র মানবজাতি এক খলিফার অধীনে শান্তির সুসীতল ছায়াতলে এক হইবে।

৩। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে ইসলাম রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং যাহা মুসলমানগণ ছাড়িয়া দিয়াছিল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মোহাম্মদী জগতের সম্মুখে সেই ইসলামকেই উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহা কুরআনের ইসলাম—মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম—যে ইসলাম দ্বারা এই দুনিয়াতে এবং এই জীবনেই খোদাতায়ালাকে লাভ করা যায় এবং যে ইসলাম দ্বারা ব্যক্তি এবং জাতি হিসাবে সঠিক অর্থে সাংসারিক ও আত্মিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভ করা যায়। তিনি অকাট্য প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শন সমূহের দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৪। বর্তমান মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসের বা আকায়েদের মধ্যে যে সব গলদ প্রবেশ করিয়াছে তিনি সেগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫। ইসলামের প্রতি বহিরাক্রমণ হইতে তিনি ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন। নাস্তিক, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি নানামহল হইতে ইসলামের উপর যেই সব আক্রমণ চলিয়াছিল ; তিনি সেইগুলিকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা খণ্ডন করেন। তিনি উহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। তাঁহার মাধ্যমে ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থা পুণঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তিনি এমন একটি মুসলমান জামাত গঠন করিয়া গিয়াছেন যাহা তাঁহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীব্যাপী পূর্ণোদ্যমে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করিতেছে।

হে ভাই মুসলমান! বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিজয়াভিযানের কাজ তো আপনার অতি প্রিয় কাজ। আলেমগণ আপোষে কুফরের ফতোয়া বিনিময় করিয়া সকল মুসলমানের কপালে অজানিতে কুফরের টিকা অঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে নিস্ক্রিয় করিয়া অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। উলেমা এবং সাধারণ সকল মুসলমানকে আল্লাহর তরফ হইতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রেমের ডাক দিয়া ঈমান ও আমলের জ্যোতির্ময় ভূষণে ভূষিত হইয়া নব জীবনের অভিষেক গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিয়া-

ছেন। সেই নব জীবন ও জ্যোতিঃ লাভ করিয়া সকলকে আজ ইসলামের বিশ্ববিজয় অভিযানে অগ্রগামী হইতে হইবে। আসুন, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হাতে সেই আশিস গ্রহণ করুন। হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর আগমনের পর বহু সময় অকাজে নষ্ট হইয়াছে। চলুন, আমাদের অতীত ত্রুটি পূরণের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জগতে বিশ্ব-নবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সকলে এক লক্ষ্যে হাতে হাত মিলাইয়া কাজে নামি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায়। বিজয় অবশ্যই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত আছে। হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আজ সেই দিন আগত প্রায় যখন সত্যের দেদীপ্যমান সূর্য পশ্চিম হইতে উদিত হইবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করিবে। সেইদিন নিকটবর্তী যখন ইস-লাম ব্যতীত সকল ধর্ম লোপ পাইবে এবং সকল বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা ও যুক্তি ব্যর্থ হইবে, কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র ততদিন পর্যন্ত না ভগ্ন হইবে, না তক্ষতা হারাইবে, যতদিন পর্যন্ত না উহা দাজ্জালী শক্তিকে চুর্ণবিচুর্ণ করিবে। খোদাতায়ালার সেই খাঁটি তৌহিদ যাহা মরু প্রান্তরের অধিবাসীগণ এবং যাহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানা-লোক হইতে বঞ্চিত তাহারাও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিবে। অচিরেই তৌহীদ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। সেই দিন না কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব থাকিবে, না কোন কল্পিত খোদার। খোদতায়ালার একটি আঘাত কুফরের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে

ব্যর্থ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহা না কোন তরবারীর সাহায্যে, না কোন বন্দুকের দ্বারা, বরং উহা হইবে সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মাদিগকে আলোক দান করিয়া। আমি বলিতেছি, তখন তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।"

[তাযকেরা, ২৯৯পৃঃ।]

আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি সকল মুসলমান ভাইকে সুমতি দেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মারফত যে মহা-সুসংবাদ দিয়াছেন তাহা অচিরেই পূর্ণ হোক। এবং সারা বিশ্বের জনগণ ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হোক। আমিন। সকল প্রশংসা আল্লাহ-তায়ালার জন্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশ্বধর্ম ও বিশ্বনবী

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

'ঘোষণা কর, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সমলের প্রতি আল্লাহ্‌র রসুল (প্রেরিত)।'

(আল আরাফ ঃ ১৫৮)।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, দুনিয়ার মানুষ এক জাতি। (সুরা ইউনুস, ২০ আয়াত)। আদিতে হযরত আদম (আঃ) তাঁহার সন্তানগণ ও অনুসারীগণসহ একত্রে বাস করিতেন। অতঃপর তাহারা গোষ্ঠী ও গোত্রের আকারে সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। পরস্পর যোগাযোগহীন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে তাহারা বহু জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমান যুগে দ্রুত হইতে দ্রুততর যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন বাহ্যিকভাবে তাহারা পুনরায় যেন এক গৃহে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শান্তি নাই—তাহারা বিভিন্ন ধর্ম, মত ও কৃষ্টি লইয়া পরস্পরের শত্রু হইয়া দ্বন্দ্ব-বিরোধে দুনিয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা চাহেন নাই। তিনি আদম সন্তানগণকে ক্ষেত্র ও কাল অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ একত্র বাসোপযোগী শিক্ষা

দিয়া আসিতেছেন। হযরত আদম (আঃ)-কে তিনি সুসভ্য জীবন যাপনের মৌলিক শিক্ষা দান করেন (সুরা তাহ, ১২৭-১২০ আয়াত) এবং ভবিষ্যতেও তাহাদিগের পথ প্রদর্শনের জন্য নবী প্রেরণের অঙ্গীকার করেন (সুরা বাকারাহ্, ৩৯-৪০ আয়াত)। তদনুযায়ী মধ্যবর্তী সময়ে যখন তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও যোগ-সংযোগহীন হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্-তায়ালা আপন অঙ্গীকার পালনে বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করিতে থাকেন (সুরা আল মহল, ৩৭ আয়াত) এবং প্রত্যেক নবীর মারফৎ এই সুসংবাদ দিয়া আসিতেছেন যে, তাহাদিগকে পুনরায় একত্রিত করা হইবে এবং সেই মহামিলনের যুগে তাহাদের একত্র বসবাসকে সর্বাঙ্গীন, সুন্দর এবং শান্তিময় করার জন্য বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিবেন এবং সেই সঙ্গে এই আদেশও দেন যেন তাহারা সকলে তাঁহাকে গ্রহণ করে।

হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সভ্য জীবন যাপনের যে সকল মৌলিক নীতি শিক্ষা দেন (সুরা তাহ, ১১৮-১২০ আয়াত) সেগুলি চিরস্থায়ী ও সর্ব যুগোপযোগী। পরবর্তী সকল সভ্য গোষ্ঠী ও জাতি সেই নীতিগুলিকে পরোক্ষভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। বর্তমান সভ্যতাও উহাদের উপর কায়েম আছে।

মধ্যবর্তী যোগাযোগহীন সময়ের নবীগণের শিক্ষা ছিল সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য এবং স্বল্প মেয়াদী। ঐ সকল শিক্ষার কার্যকারিতার

সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল মহামিলন যুগের পুর্ব পর্যন্ত। সেইজন্য ঐ শিক্ষা সম্বলিত ধর্মগুলির নাম সংশ্লিষ্ট নবী বা জাতির নামে পরিচিত।

'মহামিলন যুগ' যথাসময়ে আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালাও আপন অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ-কে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি মানুষের আন্তর্জাতিক যুগের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী বিশ্ববিধান লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ না করার কারণেই আজ দুনিয়ার পরিস্থিতি ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার মধ্যে পূর্ববর্তী স্থায়ী নীতি ও শিক্ষাসমূহ সন্নিবেসিত করা হইয়াছে (সুরা বাইয়েনাহ্-৪ আয়াত) এবং অজানা সকল বিষয়ও জানানো হইয়াছে (সুরা বাকারাহ্-১৫২ আয়াত, সুরা আলোক-৬ আয়াত)। দিবা সমাগমে যেমন গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকারাজি আকাশে সূর্যের আলোর মাঝে বিলীন হইয়া যায়, তেমনি ধর্মাকাশে আন্তর্জাতিক সূর্য তথা বিশ্বনবীর উদয়ে তাঁহার মহা জ্যোতিঃ স্ফুরণে জাতিভিত্তিক ধর্মসমুহের কার্যকারিতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে 'প্রোজ্জল সূর্য' বলা হইয়াছে। (সুরা আহ্‌যরব-৪৭ আয়াত)। অসংখ্য তারকা দ্বারা দিবসের কাজ চলে না, তাই রহমান খোদা আমাদিগকে সূর্য দিয়াছেন। তেমনি অসংখ্য কুল-নবীর দ্বারা বিশ্ব মানবের কাজ চলিবে না বলিয়া তিনি বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

"জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় খোদা"

হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধরগণ যখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইল সেই সময়ে যোগাযোগ-হীন বিশ্বের জাতিগুলি একে অপরের খবর ও সম্বন্ধ রাখিত না। ফলে প্রত্যেক জাতির নিকট ধর্ম, জাতীয় (ন্যাশনাল) ধর্ম এবং খোদা, জাতীয় খোদারূপে পরিচিত হইয়া পড়েন।

বাইবেলে খোদাকে একমাত্র বনি ইসরাইলের খোদা এবং বনি ইসরাইল জাতিকে খোদার একমাত্র মনোনীত জাতিরূপে পেশ করা হইয়াছে। (গীতাবলী-৭২ঃ১৮ এবং বংশাবলী ১৬ঃ৩৬)।

হিন্দু ধর্ম খোদাকে আর্যভারতের খোদারূপে দাবী করে। এইভাবে প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষা জাতিকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। ঐ সকল ধর্মে অপর কোন ধর্মের স্বীকৃতি নাই এবং অপর জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নাই। এমন কি এক ধর্ম অপর ধর্মের নবীগণকেও স্বীকৃতি দেয় না। কোন ধর্মে পরজাতিকে দীক্ষা দানেরও ব্যবস্থা নাই। পরজাতির কেহ ইহুদী, কেহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইতে চাহিলে তাহার পথ খোলা নাই। বেদে অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। কোন শুদ্র, বেদ শুনিলে তাহার কর্ণে গলিত শীশা ঢালিয়া দেওয়ার আদেশ আছে। (গীতম স্মৃতি-১২)। হিন্দু ধর্ম মতে কেহ ভারতের বাহিরে সমুদ্র অতিক্রম করিলে সে ধর্মচ্যুত হয়। খৃষ্টানগণ পরজাতিকে

খৃষ্টান করে বটে কিন্তু বাইবেল তাহাদিগকে এ অধিকার দেয় নাই। যীশু হযরত মুসা (আঃ)-এর বিধানকে অর্থাৎ ইহুদী ধর্মকে বিনা কমি-বেশীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিলেন। (মথি : ৫ঃ১৭-১৮)। তদনুযায়ী তিনি বনি ইসরাইলের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলিকে তালাশ করিয়া ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসেন। (মথিঃ ১৫ঃ২৪)। তাঁহার নবুয়তকে বনি ইসরাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার বনি ইসরাইল শিষ্যগণকে পরজাতির নিকটে এবং তাহাদিগের শহরে পর্যন্ত যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (মথি ১০ঃ৫-৬)। এমন কি তিনি পরজাতির এক পীড়িতা মেয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেও অস্বীকার করেন। (মথি-৬ঃ৭, ১৫-১৬)। বাইবেলের কল্যাণ কেবল বনি ইসরাইলের বারটি গোত্রের জন্য নির্ধারিত ছিল, এবং বিশ্বনবীর আগমণের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সীমিত ছিল। প্রচার ও দীক্ষা দানের অধিকার একমাত্র ইসলামেরই আছে। (সুরা আল মায়েদা, ৬৮ আয়াত)।

হযরত মুসা (আঃ)-এর মারফত আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বনি ইসরাইলকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ ও তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য কঠিন নির্দেশ দিয়াছেন : "আমি তাহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি

আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব"।

(দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ঃ১৮-১৯)।

যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, "আমি তোমাদের সহিত অধিক কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন। আর আমাতে তাহার কিছু নাই।" (যোহন-১৪ঃ৩০)। তিনি আরও বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা সেই সকল সহ্য করিতে পার না; বরং তিনি—সত্যের আত্মা (আল-আমিন) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না। কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" (যোহন, ১৬ঃ১২-১৩)। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালা সকল জাতীয় ধর্মগুলির জন্য এক সময়-সীমা বাধিয়া দিয়াছিলেন। সেই নির্দিষ্ট সময় এখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। সময়ের প্রয়োজন মিটাইবার পর এবং নবযুগের জন্য প্রয়োজনায় বিশ্বধর্মের আগমনে সাময়িক ও আঞ্চলিক তথা জাতীয়-ধর্মগুলি অচল, মৃত এবং অকেজো হইয়া পড়িয়াছে।

কোন ধর্ম কল্যাণ-প্রসূ থাকার জন্য উহার মধ্যে প্রধানতঃ চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। প্রথমতঃ উহার মূল ঐশীগ্রন্থ অবিকৃত থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ উহার প্রবর্তক নবী বা অবতারের

জীবনাদর্শ ও ইতিহাস সংরক্ষিত থাকা চাই। তৃতীয়তঃ উহার শিক্ষা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যুগে যুগে গ্লানি প্রবেশ করিলে, সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে সংস্কারক আবির্ভাবের ব্যবস্থা থাকা চাই। চতুর্থতঃ উহার শিক্ষাক্ষেত্রও কালোপযোগী থাকা চাই। যে ধর্ম এই শর্তগুলি পুরণ করে না উহা মৃত। সকল জাতীয় ধর্মের গ্রন্থগুলি বহু প্রক্ষেপ-হস্তক্ষেপ ও রদ-বদলের ফলে উহাদের আসল রূপ হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় নবীগণের ইতিহাস ও জীবনাদর্শ আজ বিলুপ্ত। ছিটে ফোঁটা দুই একটা ঘটনা লইয়া রচিত তাহাদের কিছু কাহিনী মাত্র রহিয়া গিয়াছে। বাকী সব অবাস্তব এলোমেলো গল্প। জাতীয় ধর্মগুলি কেবল গ্লানিতেই ভরিয়া যায় নাই, বরং আজ ওদের মুখ দেখিয়া ওগুলি খোদার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ধর্ম বলিয়া চেনাও যায় না। এরূপ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব-নবীর আগমনের পর হইতে ঐ সকল ধর্মের গ্লানি দূর করিতে এবং উহাদের সজীব ও সচল করিতে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে উহাদের মধ্যে আর কোন সংস্কারক আসেন নাই। কারণ জাতীয় ধর্মগুলি কেবল সংশ্লিষ্ট জাতীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং পর-জাতির স্বার্থ রক্ষায় অপারগ। উহাদের শিক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রোযোজ্য ও অচল। এই গুলির দ্বারা মানবজাতিকে বাহ্যিক বাঁধনে বাঁধা যায়, না প্রেমের বাঁধনে বাঁধা যায়। সেইজন্য এইগুলি খোদাতায়ালা কর্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়াছে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন মানব আজও এইগুলিকে আঁকড়াইয়া আছে। ফলে এই মহামিলনের যুগে ধর্ম ভিত্তিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ দেখিয়া মানবজাতির এক বিরাট দল নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের যুক্তি হইল, বিশ্বের এক খোদা থাকিলে তিনি এক জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা দিতেন না এবং তাহাদিগকে আপোষের মধ্যে শান্তির শিক্ষা না দিয়া সদা দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া রাখিতেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা জাতীয় ধর্মগুলির মেয়াদ শেষে যখন আপন অঙ্গীকার অনুযায়ী বিশ্বনবীকে পাঠাইলেন তখন যদি সকলে স্ব স্ব জাতীয় নবীর আদেশ পালন করিয়া তাঁহাকে মানিয়া লইত, তাহা হইলে ধর্ম নিয়া কলহ-বিবাদ ঘটিত না এবং নাস্তিকরা যদি বিশ্ব-নবীর আদেশে সাড়া দিত বা তাঁহার দাবী ও শিক্ষা পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে ধর্মের বিরুদ্ধে বা খোদার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগের পথ থাকিত না। আল-কোর-আনের পূর্পবর্তী পুস্তকগুলিতে এখন খোদার অস্তিত্বের কোনও যুক্তি বা নিদর্শন প্রকাশকারী প্রমাণ নাই। একমাত্র কোর-আন করীমই যুক্তি ও নিদর্শনগতভাবে খোদাতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া দেখিতে পারে।

পুনঃমিলন-যুগ এক বিশ্ব-বিধানদাতা বিশ্বনবীর প্রত্যাশা রাখে। হযরত আদম (আঃ)-এর জগত বিস্তৃত বিংশধরগণের আজ বাহ্যিকভাবে পূনর্মিলন ঘটিয়াছে। এই মহামিলনকে আত্মিকভাবে পূর্ণতা দান করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ-এর মারফৎ প্রেরিত 'ইসলাম'কে একমাত্র ধর্মরূপে মনোনীত করিয়াছেন (সুরা মায়েদা ৪অয়াত)। তিনি সকল ধর্মকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন, এবং কাহারো নিকট হইতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন (আলে ইমরান, ৮৬ আয়াত) এবং এই ধর্মেই তিনি মৃত্যুবরণ করিতে বলিয়াছেন (আলে ইমরান,১০৩ আয়াত)। এই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌তায়াল হঠাৎ এবং অকারণে করেন নাই। যুগের জরুরত এবং পূর্বে-প্রদত্ত সুসংবাদ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি এইরূপ করিয়াছেন। আদম (আঃ)-এর বংশধরগণ সকলেই মানব, এবং তাহাদের সৃষ্টির ছাঁচ তাহাদের কথা-বার্তা, চালচলন, রং, রুচি ইত্যাদির মধ্যে বহু অমিল থাকিলেও তাহাদের সকলের প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ডনীয় ঐক্য বিরাজমান, যাহা মহান ও এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। মানবজাতির প্রকৃতি ঐক্য সাধনকারী সার্বজনীন বিশ্ববিধান চাহে। তদনুযায়ী মানব প্রকৃতির অখণ্ডনীয় ঐক্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফৎ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্ব-কালীন, সার্বজনীন সঠিক কল্যাণকর বিধান দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন যে, তিনি মানুষকে ইসলামের ছাঁছ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার প্রকৃতি অখণ্ডনীয়। (সুরা রুম, ৩০ আয়াত)। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক শিশু ইসলামী প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পরে তাহাদিগের মাতাপিতা তাহাদিগকে ইহুদী বা খৃষ্টান বা মজ্জসী করে।

ইসলামের বিশ্বরূপ

ইসলামের শিক্ষা কোন ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থ-ভিত্তিক নহে। বরং ইহা মানব প্রকৃতি-ভিত্তিক। ইহা সকলের স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং সকলের সব গুণাবলীর পালন, উন্নয়ন ও বিকাশকারী। ইসলামে খোদা কোন ব্যক্তি বা জাতির একচেটিয়া খোদা নহেন, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক। তাঁহার সুমহান দৃষ্টিতে সমলেই সমান। কুরআন মজিদের সর্ব প্রথম সুরা ফাতেহার প্রারম্ভিক আয়াতগুলিতে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তিনি 'অযাচিত দানশীন, বার বার করুণাকারী, সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক ও বিচার সময়ের প্রভু।'

এই ধর্মের নাম কোন জাতি, দেশ বা নবীর নামে রাখা হয় নাই। সকল স্তরের মানুষের আত্মা ইহকালের ও পরকালের জন্য যাহা কামনা করে তথা 'শান্তি' শব্দ দিয়াই ইহার নাম রাখা হইাছে 'ইসলাম' অর্থাৎ 'শান্তি'। ইহা মানব-প্রকৃতির ক্ষুধা নিবারক। সুতরাং ন্যায্যভাবে ও সর্বতোভাবে ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্য গ্রহণীয় সুরা জাসিয়া, ২১ আয়াত)।

ইসলাম ধর্মের ঐশী গ্রন্থের নাম 'আল-কুরআন' অর্থাৎ 'পূর্ণ পাঠ্য''। ইহা সমগ্র মানবজাতির জন্য, মনুষ্যত্ব ও মানবতার জন্য এবং মানবের সকল জরুরত পূরণের জন্য, এবং তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বময় কল্যাণের জন্য পূর্ণ পাঠ্য। ইহাতে সকল বিষেয়র মীমাংসা দেওয়া আছে। (সুরা দুখান, ৫ আয়াত)। সুতরাং ইহা সর্ব বরেণ্য।

আল-কুরআনের ভাষা আরবী। ইহা আজ সাব্যস্ত যে আরবী সকল ভাষার জননী। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রণীত "মিনানুর রহমান" পুস্তক এবং **Arabic is the Mother of all Languages, by Md. Mazher** দ্রষ্টব্য। মা সকল সন্তানের আপন। সুতরাং ইহা সকল ভাষার আপন ধন।

আরবী ভাষা আজও জীবন্ত এবং বহু দেশের মাতৃভাষা, কথিত ও সাহিত্যিক ভাষা। বাকী সকল ধর্ম গ্রন্থের ভাষা আজ মৃত। আল-কুরআনের প্রথম শব্দ 'বিসমিল্লাহ'-এর 'বে' হইতে শেষ সুরা আল-নাসের শেষ শব্দের শেষ অক্ষর 'সিন' অক্ষর পর্যন্ত আগাগোড়া আল্লাহর নিজস্ব কালাম এবং আদি আকারে সংরক্ষিত। ইহার মধ্যে একটি আ'কার ই'কারেরও পরিবর্তন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। খোদাতায়ালা স্বয়ং ইহার হেফাজতের ভার লইয়াছেন। (সুরা হিজর, ১০ আয়াত)। বাইবেলেও ইহার এই বিশেষত্বের তস্‌দীক আছে। (যোহন, ১৬:১৩, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮:১৮-১৯) আল-কুরআনের শত-সহস্র হাফেজ, পুস্তকাকারে ইহার বহুল বিস্তার, নামাজ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূল কুরআনের আয়াত অথবা সারা গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহার বাহ্যিক সংরক্ষণ অটুট আছে।

আল-কুরআনের অর্থ বুঝিবার জন্য বহু তফসীর, আরবী ভাষী বহু আলেম বর্তমান আছেন এবং সময়ে সময়ে প্রেরিত সংস্কারকের মারফৎ ইহার সহি ব্যাখ্যা, তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন ও সময়ে-

পযোগী করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক বলবৎ আছে। (সুরা কেয়ামা, ২০ আয়াত)। পরবর্তী যুগে ইসলাম ধর্মের উদ্ভুত গ্লানিসমূহ সংস্কারের জন্য হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস হিসাবে মোজাদ্দেদীন ও শেষে হযরত ইমাম মাহুদী (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী ইসলামকে যিন্দা, তাজা ও সময়োপযোগী রাখার জন্য অতীত শতাব্দীগুলিতে ইসলামে মোজাদ্দেদীনের আবির্ভাব হইয়াছে এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া ইসলামের শিক্ষা ও আমলের উপর স্তুপীকৃত সকল কুসংস্কার ও গ্লানি দুর করিয়া উহাকে আকিদায়, আমলে, নৈতিকতায়, আধ্যাত্মিকতা ও সফলতায় আদি আকারে একমাত্র কার্যকরী ও সময়োপযোগী ধর্মরূপে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, উহা তরবারার বলে জয়যুক্ত হইয়াছিল, তাই আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত ইসলামের অপরাজেয় শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার ও আমলের আদর্শ এবং নির্দেশাবলী লইয়া আজ বিশ্ব ময়দানে মহা আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ সহ অবতীর্ণ হইয়াছে। হিজরা পঞ্চদশ শতাব্দী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের শুভ শতাব্দী সমাগত প্রায়। অচিরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর চির কল্যাণবর্ষী শক্তি, জ্যোতি ও সৌন্দর্য বিনা তরবারী, বিনা তোপ-

কামান ও বোমায় জগদ্ব্যাপী সমগ্র মানবজাতিকে অমর জীবনের প্রেমময়, শান্তিভরা প্লাবনে প্লাবিত করিবে। (সুরা সাফ.১০ আয়াত)। হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর হইতে ইসলামের বিশ্ব বিজয় যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে।

কুরআন করীম ব্যতিরেকে অপর কোন ধর্মগ্রন্থ নির্ভেজাল 'আল্লাহ্‌র কালাম' ছিল না। উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কালাম, সংশ্লিষ্ট নবীর বাণী, তাহাদের শীষ্যগণের কথা এবং বর্ণনা ও সংকলনকারীদের মন্তব্য ও ভাষা সংমিশ্রিত হইয়া আছে। ইহা ছাড়া উহাদের উপরে বহু হস্তক্ষেপে বহু রদ-বদল হইয়া গিয়াছে! আজ কোরআন করীমের কষ্টি-পাথরে (সূর) মায়েদা, ৪৯ আয়াত) যাচাই করিয়া উহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম, নবীগণের বাণী এবং সাধুগণের কথা উদ্ধার করা যাইতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, সকল জাতীকে মৌলিক বিধান হিসাবে ও তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কেতাব কুরআন করীমের কিছু কিছু টুকরা বা খণ্ড বিশেষ দেওয়া হইয়াছিল (সুরা আলে-ইমরান, ২৪ আয়াত) এবং উহাদের মধ্যে যেগুলি স্থায়ী ও সর্ব যুগোপযোগী সার্বজনীন শিক্ষা ও নির্দেশ ছিল, সেগুলিও কোরআন করীমে সন্নিবেশিত আছে। (সুরা বাইয়েনাহ্, ৪ আয়াত)। দুনিয়ার বুকে আজ সকল দিক দিয়া একমাত্র ত্রুটিহীন, সন্দেহহীন ও নিঃস্কলুষ ধর্মগ্রন্থ হইল কুরআন করীম। পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই এই দাবী বিদ্যমান। (সুরা বাকারাহ্, আয়াত ৩)।

বিশ্বনবীর নাম (হযরত) মোহাম্মদ (সাঃ) অর্থাৎ "চরম প্রশংসিত"। সর্ব প্রকার প্রশংসার অধিকারী আল্লাহর পূর্ণ প্রকাশের স্থল তিনি সঙ্গতভাবে প্রশংসিত। তিনি সমগ্র মানবজাতির রসুল রূপে প্রেরিত হইয়াছেন। (সুরা আন-ফাল, ১৫৯ আয়াত)। তিনি খোদা ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন ন। তিনি আমাদের ন্যায় মানুষ ছিলেন (সুরা কাহাফ-১১১ আয়াত)। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে 'ইয়াসীন' অর্থাৎ "পূর্ণতম মানব" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি সর্ব প্রকার মানব সুলভ গুণাবলীর উচ্চতম মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (সুরা কালাম, ৫ আয়াত)। তাঁহার জীবনী আজও আমাদের নিকট খোলা পুস্তক। তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি কথা কাজ ও ঘটনা ঐতিহাসিক সত্যের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত, নিঃসন্দেহ ও নিস্কলঙ্ক। তিনি জীবন্ত কুরআন ছিলেন। কুরআন করীমে যাহা লিখা আছে, উহা সকলই তাঁহার কর্মময় জীবনে চিত্রিত আছে [হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাক্ষ্য]। সর্বস্তর ও সর্ব অবস্থার মানুষের জন্য তাঁহার জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে (সুরা আযহাব, ২২ আয়াত)। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী নিজ নিজ জাতির জন্য কল্যাণ আনিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের জন্য চির রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। (সুরা আম্বিয়া, ১০৮ আয়াত)। তাঁহাকে ভালোবাসিলে আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা লাভ হয়। সুরা আলে-এমরান, ৩২ আয়াত। সুতরাং তিনি সকল

মানুষের প্রেমের পাত্র এবং "প্রশংসিত" নাম লাভের যোগ্য। বংশ, কর্ম, ধন, পদ, রং, দেশ ও কাল প্রসূত সকল বিভেদ দূর করিয়া ইসলাম দুনিয়ার সকল মানুষকে ভাই ভাই করিয়া দিয়াছে। ইহা আদমের বংশধরগণকে পুনরায় তাহাদের পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। ইহা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বার সকলের জন্য সমভাবে খুলিয়া গিয়াছে। মসজিদে এবং খাওয়ার মাহফিলে কাহারও আসন সংরক্ষিত নাই। সৎকর্ম, নিষ্ঠা, সততা ও সাধুতার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে মানুষের সম্মান নির্ধারিত হয় (সুরা আল্-হুজুরাত, ১৪ আয়াত)। নামাজে বংশ, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে যে কোন সৎকর্মশীল মুসলমান ইমামতি করিতে পারে। কিন্তু বাকী ধর্মে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বা ধর্ম যাজক ব্যতীত কেহ পূজা উপাসনায় নেতৃত্বের অধিকারী নহে।

ইসলামের খোদা চির যিন্দ। তিনি এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, সবাক ও প্রেমময় খোদা। তাঁহার দাসগণের ডাক শুনিবার জন্য তাঁহার দ্বার সদা অবারিত এবং সারা ধরা-পৃষ্ঠ তাঁহার আরাধনার আসন। তিনি মানুষের চলমান, দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শয়ন সকল অবস্থায় প্রার্থনা গ্রহণ করেন (সুরা আলে এমরান, ১৯২-১৯৬ আয়াত) এতদ্ব্যতিরেকে আল্লাহতায়ালার সহিত নির্ধারিত মিলনের দরবার সমষ্টিগতভাবে বা একা দৈনিক ৫ বার খোলা আছে। বিশেষ

মিলনের আরও সময় আছে। কিন্তু এসব আনুষ্ঠানিক ফাঁকা কারবার নহে। তিনি তাঁহার দাসের জন্য আজও অপূর্ব নিদর্শন প্রকাশ করেন এবং তাহাকে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে ফেরেস্তা মারফৎ সুসংবাদ দেন (সুরা হামিম সিজদা, ৩১-২২ আয়াত) ইসলাম ব্যতিরেকে অপর কোন ধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে এইভাবে প্রার্থনার জবাব পাওয়া যায় না। তিনি নিত্য নিত্য তাঁহার দাসগণের নিকট তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা বড় সত্য। মানব-আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তার প্রতিচ্ছায়ায় সৃজিত। সুতরাং আল্লাহ্‌ তায়ালার অস্তিত্বের স্বীকৃতি মানব-আত্মার স্বভাবজাত অভিব্যক্তি (সুরা আরাফ, ১৭৩ আয়াত)। কাহারও এই স্বীকৃতির হাত এড়াইবার উপায় নাই। হাঁ বা না রূপে তাঁহাকে স্মরণ করিতেই হইবে। পীড়িত আত্মা তাঁহাকে 'না' আকারে স্মরণ করে। মন হইতে যত বেশী কেহ তাঁহাকে তাড়াইতে চাহিবে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাহার মধ্য হইতে 'না' ধ্বনী তত বেশী উচ্চ হইয়া উঠিবে। সত্যের শক্তি ঘটনার আঘাতে পরিণামে তাহার অস্বীকৃতির মস্তককে অবনত করিয়া আত্মসমর্পনে বাধ্য করে। যাহা নাই তাহা নাই বলিয়া অবিরাম বকাবকি ও লিখালিখি এবং বহু শ্রম ও অর্থব্যয় সুস্থ মন ও মস্তিষ্কের পরিচায়ক নহে। নাস্তিকগণ রুদ্ধগৃহে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল অহরহ "খোদা নাই"-এর মালা জপিল ; এখন আবার

তাহারা রুদ্ধদ্বার খুলিয়া স্ব-হস্তে স্বীয় আঙ্গিনায় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্মেলনের আসন পাতিয়া দিল। কেন এই পরিবর্তন? প্রকৃতির বিধান তাহাদিগকে মহা সত্যের দিকে প্রবলভাবে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, অচিরে তাহারা জাতিগতভাবে ইসলামের ক্রোড়ে আত্ম সমর্পন করিবে।

ইসলামের শিক্ষা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল জাতির নবীগণকে সত্যায়িত করে। (সুরা আল-নহল, ৩৭ আয়াত)। ইহার পূর্বে কোন নবী পরজাতির নিকট সত্যের আসন পায় নাই। ধর্মগ্রন্থগুলিরও একই অবস্থা। একমাত্র ইসলাম অতীত নবী ও ধর্ম সকলকে স্বীকৃতি দিয়া (সুরা বাকারাহ্-২৮৬ আয়াত) এবং সকল নবীকে নিষ্পাপ ঘোষণা করিয়া সকল জাতির মহাপোকার সাধন করিয়াছে। ভবিষ্যতের জন্যও ইহা কল্যাণের হস্ত বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন জাতির নবী এবং সেই সব জাতিগণের মহাপোকারের একটা বড় দৃষ্টান্ত এই যে ইসলামের অব্যবহিত পূর্বের নবী হযরত ঈসা (আঃ); তাঁহার জন্ম ও ক্রুশে মৃত্যুর ব্যাপার এরূপ যে আল-কুরআন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার উপর আরোপিত দোষসমূহ স্খালন করিয়া বণি ইসরাইলের জন্য তাঁহার সত্য ও পবিত্র নবী হওয়ার সাক্ষ্য না দিলে, ঘটনা ও তন্মূলে ইহুদীগণের আপত্তি সমূহের কারণে তাঁহাকে কোন মর্যাদার আসনে গ্রহণ করা মুস্কিল হইত।

ইসলামের শিক্ষা বড়ই উদার ও সহনশীলতা পূর্ণ। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা পুরাতন ধর্মগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন, তথাপি তিনি ধর্ম লইয়া হানাহানি চাহেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই। (সুরা আল-বাকারাহ্‌, ২৫৭ আয়াত)। সহিষ্ণুতা ও সহ-অবস্থানের এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা আর কোথাও নাই। ধর্ম মানা বা না মানার বিষয়ে তিনি মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। তিনি চাহেন, প্রত্যেক মানুষ বুঝিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণ করিবে। (সুরা দহর, ৩০ আয়াত)। ইহার জন্য তিনি প্রায় ১৪০০ বৎসর সময় দিয়াছিলেন। এখন জগতের পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে মানবজাতিকে বাঁচিতে হইলে ইসলামের শিক্ষা পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ তাহাদের নিজ হাতেই তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করিয়া পূর্ণ-জীবন ও শান্তি একমাত্র ইসলাম দিতে পারে। বাইবেল, পবিত্র কুরআন ও সকল ধর্ম-পুস্তকে ইহার মিশ্রিত সুসংবাদ বিদ্যমান।

অতীতের সীমিত গণ্ডীর সংকীর্ণ শিক্ষায় অভ্যস্ত বর্তমানের প্রবল জাতিগুলি তাহাদের পুরাতন অভ্যাস ও মানসিকতায় জগতকে নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র, ভাষা ইত্যাদির সীমা দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দুর্বলগণের অধিকার ও গতিবিধিকে দুঃখজনকভাবে খর্ব করিয়া দিয়াছে। একমাত্র ইসলামের শিক্ষা সংকীর্ণ মনকে প্রশস্ত এবং সংকুচিত অবস্থাকে প্রসারিত করিয়া সকলের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ জীবন যাপনের পথ খুলিয়া

দিতে পারে। আল্লাহ্‌আয়ালা বলিয়াছেন যে তিনি বিশ্ব চরাচরকে মানবের সেবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। (আলে এমরান, ৩৮ আয়াত) ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম বিধায় ইহার ধর্মীয় শিক্ষা জড় প্রকৃতির সহিত এবং জাগতিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার সহিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা এক মানদণ্ডে বাঁধা, সেইজন্য ইহার ইহলোকের শিক্ষা পরলোকের শিক্ষার উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

ইসলাম কখনই ধর্মকে দুনিয়া হইতে পৃথক করিয়া মানুষের জন্য উশৃঙ্খল দায়িত্বহীন ও পাপাচারী হইবার পথ খুলিয়া দেয় নাই। (সুরা আল-মুমেনুন, ১১৬ আয়াত)। ইহা তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু কাল পর্যন্ত সারা গতি-পথকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। ইহা জগতের কল্যাণকে ধর্মের কল্যাণের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, ইহলোক পরলোকের জন্য শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ। ইহলোকে যেরূপ কর্মের চাষ করিবে, পরলোকে তেমনি প্রতিদানের ফসল পাইবে। তাই আল্লহতায়ালা কোরআনে ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণ একই সঙ্গে চাহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। একটির অকল্যণ অপরটির জন্য অগ্নিবর্ষী। (সুরা বাকরাহ্‌, ২০২ আয়াত)। ইসলামের কোন শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া পার হওয়া যাইবে না।

ইসলাম মানুষের 'সু' এবং 'কু' অর্থাৎ গুড এবং অজড় উভয় প্রকার বৃত্তি সমূহের কোনটিকে উপেক্ষা করে নাই। ইহা মানুষের বাসনা ও কমনা সমূহকে নিছক মন্দ ও বর্জনীয় ঘোষণা

করে নাই। এগুলি এরূপ হইলে করুণাময় স্রষ্টা কখনও এগুলি মানুষের স্বভাবে চালাইয়া দিয়া তাহাকে বিড়ম্বিত করিতেন না। বস্তুতঃ এ গুলির ব্যবহার পদ্ধতি এ গুলিকে ভাল বা মন্দ করে। সদ্ব্যবহারে এ গুলি মহা হিত-সাধনকারী হয় এবং অপব্যবহারে ক্ষতিকর হয়। বৌদ্ধগণ বাসনা ও কামনা সমূহকে মন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐগুলিকে বর্জন করিয়া নির্বান লাভের শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা অপ্রাকৃতিক ও অসুস্থ এবং পালনের অযোগ্য। এ পথে চলিলে জগতের সব কাজ কারবার এক মুহূর্তে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে অচিরেই মানবজাতির বিলোপ সাধন হইবে। ইসলাম প্রকৃতিকে সঙ্গত পথে মানুষের সুবৃত্তিগুলির প্রগতিশীল পরিচালন ও পুষ্টি সাধন করিয়া কুবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাদিগকে কল্যাণমুখী করিয়া দেয়। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রণীত "ইসলামী নীতি দর্শন" পুস্তক পাঠ করুন।

ইসলাম মানুষের জ্ঞানের পিপাসাকে রোধ করে না। আল-কুরআন আল্লাহতায়ালার পূর্ণ বিধান পুস্তক এবং প্রাকৃতিক বিধান তাঁহার সৃজিত। উভয়ের উৎস এক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। উভয়কে তিনি এক মানদণ্ডে সৃষ্টি করিয়াছেন। (সুরা শুরা, ১৮ আয়াত ; সুরা রহমান, ৮৯ আয়াত)। কুরআনের বিধান এবং প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নাই। সুরা মুলকের প্রথম রুকুতে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আল্লাহতায়ালা

আমাদিগকে বার বার আহ্বান জানাইয়াছেন। তদনুযায়ী দেখা যায়, সর্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার দুয়ার খুলিয়া দেয় প্রথমে মুসলমানরাই। আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন এটমের মধ্যে যে অভিন্ন চতুর্থ শক্তিটি ৩০ বৎসরের নিরলস গবেষণার পরও সনাক্ত করিতে পারেন নাই, সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ লাভকারী প্রোফেসর জনাব আবদুস সালাম সাহেব আল-কুরআনের সূত্র ধরিয়া উহারই পরিচয় বাহির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সভ্য ও উন্নত হিন্দু ও খৃষ্টানগণের ধর্মের অবস্থা এই যে, হিন্দু ধর্মে সমুদ্র পারে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং খৃষ্ট-ধর্মে পরজাতির নিকট তাহাদিগের শহরে যাওয়া নিষিদ্ধ। খৃষ্টান ধর্মে এমন কি জ্ঞান-বৃক্ষের নিকট যাওয়া এবং উহার ফল ভক্ষণও নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ। এই জন্য এক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিস্কার করিয়া পাদরীগণের হস্তে গ্যালিলি প্রভৃত নির্যাতন ভোগ করেন এবং কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কার করিতে চাহিয়া হাস্যস্পদ হইয়াছিলেন। অথচ নিরক্ষর নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁহার অনুগামীগণকে তখনকার দিনের দুর্গম চীনে যাওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন এবং জ্ঞানার্জন মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এইরূপ কল্যাণকর যে উহা পূর্ণাঙ্গীনভাবে চালু করিলে দুনিয়ার কোথাও মানুষের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল হইল

সম্পদের অসম বন্টন এবং মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে উহা পুঞ্জি-ভূত হওয়া। ইসলাম ইহার সুষ্ঠু সমাধান দিয়াছে। যুলুমের দ্বারা নহে, বরং সুনীতি নির্ধারণ করিয়া ইহা অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জাতির সকল স্তরে অর্থের সুসম বন্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সূত্র হইল, (১) ধনকে সদা সচল রাখিতে হইবে; ইহা কোন সময়ে কোথাও যেন জমিয়া না যায়। (সুরা হাশর, ৮ আয়াত)। (২) ধনে হক হিসাবে অভাবীগণের নির্ধারিত হিস্যা আছে, অভাবের জন্য যে হাত পাতে তাহারও এবং যে লজ্জার কারণে চাহে না তাহারও অংশ আছে। (সুরা মায়ারেজ, ২৫-২৬ আয়াত)। (৩) সুদকে হারাম করা হইয়াছে এবং ইহার স্থলে ব্যবসায়কে হালাল করা হইয়াছে এবং দান-খয়রাত, যাকাত, সদকাত ইত্যাদি আকারে ধন-বন্টনের আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। (সুরা বাকারাহ-১১৭ আয়াত; সুরা রুম, ৪০ আয়াত)। (৪) বেশী ধনী ব্যক্তির উপর মৃত্যুর পূর্বে তাহার সম্পত্তির একাংশ ওসিয়ত (উইল) ফরজ করা হইয়াছে (সুরা বাকারাহ, ১৮১ আয়াত) এবং ইহার পরিমাণ সর্বোচ্চ ⅓ অংশ (বুখারী)। (৫) ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নির্দিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টন করা বাধ্য করা হইয়াছে। (সুরা নেসা, ৮-১৪ আয়াত)। (৬) প্রকৃত অক্ষম ঋণীর ঋণ মওকুফ করিয়া দিতে হইবে। (সুরা বাকারাহ, ২৮১ আয়াত)।

সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ্ ; মানুষ সাময়িক আমানত-দার। ইহার পরিচালনা সম্বন্ধে মালিকের আদেশ পালিত হইলে জগতে অর্থনৈতিক স্বর্গ নামিয়া আসিবে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত মূল্য দিয়াছেন। বিচার-ইনসাফের মাধ্যম ছাড়া কাহাকেও হত্যা করাকে তিনি সমগ্র মানবজাতির হত্যার সমতুল্য গণ্য করিয়াছেন। সঙ্গত-ভাবে তাই আল্লাহতায়ালা অভাবের ভয়ে ভ্রূণ-হত্যা নিষেধ করিয়াছেন এবং ইহাকে মহা অপরাধ বলিয়াছেন। (সুরা বণি ইসরাইল, ৩২ আয়াত)।

ইসলাম স্বজাতি, বিজাতি ও আপন পর সকলের মধ্যে প্রত্যেকের দাবী-দাওয়া, স্বার্থ এবং ন্যায্য অধিকার এমন নিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে যে, কোন অভিযোগ বা অশান্তির কারণ ঘটাইতে পারে না। কুরআন করীম নিরপেক্ষতার মানদণ্ড-স্বরূপ। (সুরা আল-শুরা, ১৮ আয়াত)।

বাদশাহ বা শাসকের দায়িত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারিত করিয়াছেন যে, প্রজাকুলের মধ্যে কেহ কেহ তৃষ্ণার্ত, ভূখা, উলঙ্গ, গৃহহীন, চিকিৎসাহীন শিক্ষাহীন থাকিবে না। প্রত্যেকটি মানু-ষের সদবৃত্তির ও গুণাবলীর বিকাশ ও পরিবর্ধনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শাসক ও শাসিতের উভয়ের জন্য ইসলাম কল্যাণকর নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। শাসন ক্ষমতা এক পবিত্র আমানত।

শাসিতগণ উহা যোগ্য হস্তে ন্যাস্ত করিবে এবং কর্তৃপক্ষ সেই আমানত স্বার্থ ও পক্ষপাত-শুন্য হইয়া জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শাসিতের সেবা ও সর্বময় কল্যাণে নিয়োগ করিবে। (সুরা নেসা, ৫৯ আয়াত)।

জাতি সমূহের স্বার্থ, অধিকার ও শান্তি সংরক্ষণের জন্য ইসলাম সুষ্ঠু নীতি শিক্ষা দিয়াছে। যদি দুই জাতির মধ্যে বিবাদ বাধে, তাহা হইলে বাকী জাতিগুলি দুই জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবে, নিষ্ফল হইলে সকল জাতি মিলিত ভাবে অন্যায়কারী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং ঐ জাতি নত হইয়া শান্তিপ্রার্থী হইলে বিবাদমান জাতি দুইটির অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া বিরোধী বিষয়ে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। (সুরা আল-হুজুরাত)। জাতিসংঘে এই নীতি পালিত হইলে জগত হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নির্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু উহার অবস্থা ভিন্নতর এবং ভয়াবহ। কেননা, জাতিসংঘের উপরে কোন 'একক কম্যাণ্ড' নাই।

নারী ও পুরুষ লইয়া মানব জাতি। তাহাদের কর্ম ক্ষেত্র দুইটি। একটি গৃহের ভিতরে অপরটি গৃহের বাহিরে। দুইটি কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতিও পৃথক। সেইজন্য আল্লাহতায়ালা পুরুষকে গৃহের বাহিরে অর্থাৎ বহির্জগতে কার্য নির্বাহ করিবার উপযোগী প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার ক্ষেত্র বহির্জগত নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকের প্রকৃতিকে গৃহরাজ্যে কার্য

করিবার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার কর্মক্ষেত্র গৃহরাজ্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। (সূরা আল-আহযাব, ৩৫ আয়াত)। উভয় ক্ষেত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান মনোযোগের যোগ্য। গৃহ-রাজ্যের রাণী হিসাবে উহার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের জন্য সন্তান-পালন স্ত্রী জাতির মহান কর্তব্য এবং মানবজাতির সার্বিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাহাদিগের কর্মক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিলে উহা প্রকৃতি বিরোধী হইবে এবং মানব জাতি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবে—ফলতঃ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে। গাড়ীর দুই দিকের চাকা এক দিকে লাগাইলে যে অবস্থা হয়, উহাই ঘটিবে। পুরুষ ও স্ত্রীজাতি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যরত থাকিলে সমাজ ও জাতি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল থাকিবে। তদুদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা পুরুষ ও স্ত্রী জাতিকে তাহাদের কার্য ক্ষেত্রের দায়িত্ব ও কার্যোপযোগী শক্তি বা কামলতা এবং প্রকৃতি ও যোগ্যতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

সমাজ ও জাতিকে পবিত্র রাখার জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যুবক ও যুবতী বিবাহযোগ্য হইলে বিবাহ দাও। এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জানাইয়াছেন যে, যথাসময়ে বিবাহ না দেওয়ার কারণে তাহারা ব্যভিচার করিলে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের পিতা-মাতাকে সেই অপরাধের জন্য দণ্ডিত করিবেন। ইসলামের এই শিক্ষা এবং পর্দার আদেশ পালিত হইলে সমাজ পবিত্র থাকিবে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী (রাঃ আঃ-গণের জীবনে মানবজাতির জন্য বিভিন্ন এবং বিরূপ অবস্থার মধ্যে কুমার জীবন, অসম বয়সের বিবাহিত জীবন, যুবকের সহিত বৃদ্ধার, বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ জীবন, বিধবা ও বিপত্নীকের একক ও বিবাহিত জীবন, পুরুষের এক এবং একাধিক বিবাহিত জীবন এবং অনেক সতীনের পারস্পরিক জীবন কিভাবে পবিত্রতা নৈতিকতা, প্রেম, প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও শান্তি বজায় রাখিয়া যাপন করা যায় তাঁহার নিষ্কলঙ্ক, প্রশংসনীয় ও সর্বোত্তম আদর্শ রহিয়াছে। ইহার একশত অংশের একাংশ আদর্শও অন্য কোন নবীর জীবনে নাই।

প্রতিটি মানুষের সত্তা পবিত্র। কর্মদোষে সে পাপী হয়। কিন্তু একে অপরের অপরাধের জন্য দায়ী নহে। পাপ অস্থায়ী কালিমা। তাই প্রত্যেক অপরাধী অনুতাপ, সংশোধন ও সৎ-কর্মের দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া আল্লাহতায়ালার প্রিয়-ভাজন হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ঘোষণা কর, হে পাপীগণ। আমার রহমত হইতে কেহ নিরাশ হইও না। অমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব।" (সুরা জুমর, আয়াত ৫৫)। ইসলামের এই শান্তিপুর্ণ শিক্ষা সত্য নিদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শত্রুকে ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের এরূপ দৃষ্টান্ত-বিহীন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন যে উহা মানব জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে জগত একদিনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। নবুয়তের দাবী করায় মক্কাবাসীগণ তাঁহার

প্রাণঘাতি শত্রু হইয়া যায় এবং সারা আরববাসীগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। অথচ যখন তিনি দশ সহস্র সাহাবা (রাঃ) লইয়া মক্কা অভিযান করেন, তখন তিনি বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন এবং ঘোষণা করেন, "আজ তোমাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই" এবং সকলকে ক্ষমা করিয়া দেন। তিনি ছিলেন জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং জীবনদাতা। অথচ যীশুর পুজারী খৃষ্টান-জাতিগণ যাহারা যীশুর একচেটিয়া ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের জগতময় গুণ-গাণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা গত দুই মহা যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের নেতাগণের বিচারের প্রহসন করিয়া তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাহারা ক্ষণিকের তরেও একথা ভাবিয়া দেখে নাই, বিপক্ষ দল জয়ী হইয়া তাহাদের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিলে, তাহাদের কেমন বোধ হইত। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সারা জীবন ভরা ক্ষমা ও দয়ার যে অপূর্ব ও সংখ্যাবিহীন দৃষ্টান্ত রহিয়াছে উহার মোকাবেলায় কোন নবীর জীবনী পেশ করা যাইবে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য একটি ডুমুরের গাছের নিকটে যাইয়া উহার ফল দেখিতে না পাইয়া যীশু গাছটিকে অভিশাপ দেন যেন উহাতে আর কখনও ফল না ধরে। এই অভিশাপে গাছটি আচরেহ মরিয়া যায়। (মথিঃ ২১ঃ১৯)। তিনি গাছটিকে আশীর্বাদ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি আশীর্বাদপ্রার্থী পরজাতী এক বিপদগ্রস্থা বৃদ্ধানারীর করুণ

আবেদনও প্রত্যাখান করেন। (মথি ১৬ঃ২২-২৬)। খৃষ্টানজাতি যাহারা পরবর্তীতে এযাবৎ ইসলাম ধর্ম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘোর বিরোধিতা ও চরম শত্রুতা করিয়া আসিতেছে, উহা তিনি পূর্ব হইতে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি তিনি অভিশাপ দিয়া যান নাই। বরং তিনি যেমন মক্কা ও আরববাসীগণকে ক্ষমা করিয়া দেন, তেমনি খ্রীষ্টানজাতির দরদে তাহাদের হেদায়েতের জন্য তিনি আল্লাহ্-তায়ালার দরবারে এরূপ সকাতরে অবিরাম দোওয়া করিতে থাকেন যে আল্লাহতায়ালা বলেন, "তুমি কি তাহাদের দুঃখে নিজেকে ক্ষয় করিয়া দিবে, যদি তাহারা এই বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করে?" (সুরা কাহাফ, ৭ আয়াত)।

ইসলাম পারলৌকিক জীবনের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপুর্ণ নক্শা দিয়াছে, যাহার ঝলক ইহজীবনেও অভিজ্ঞান করিয়া বিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হওয়া যায় এবং আত্মার প্রতীতি ও ও প্রশান্তি লাভ করা যায়। ইসলাম বেহেশতকে আল্লাহ্-তায়ালার পূর্ণ প্রেমের জ্যোতি ধারায় সমুজ্জল চির-উন্নতশীল অনন্ত আবাস করিয়াছে এবং দোযখকে পাপীর কুফল জনিত ব্যাধি নিয়াময়ের পর, তাহাকে জান্নাত বাসে উপযোগী করার জন্য হাসপাতাল স্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছে। আল্লাহতায়ালা দোযখকে ক্রোধ বা বিদ্বেষে সৃষ্টি করেন নাই, বরং আপন করুণায় আধ্যাত্মিক ব্যাধি-গ্রস্থগণের আরোগ্যের জন্য ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যন্ত্রণায় কাতর রোগীর জন্য হাসপাতাল রহমত

স্বরূপ এবং সমুজ্জল ও আনন্দমূখর ভোজগৃহ জাহান্নাম স্বরূপ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, দোযখের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখম আল্লাহতায়ালার রহমত উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে এবং উহার মধ্যে একজনও থাকিবে না। পূর্বের অচল জাতীয় ধর্মগুলি পরজাতির জন্য চির-দোযখ নির্দ্ধারিত করিয়াছে। পরজাতীর কাহারো কোন পুণ্য পরলোকে কাজে আসিবে না। (সুরা জিলজাল, ৮-৯ আয়াত)। তিনি কাহারও কর্ম নিষ্ফলে যাইতে দিবেন না। (সুরা এমরান, ১৯৬ আয়াত)।

ইসলাম সকল মত, পথ ও ইজমের শান্তিপূর্ণ সফলকাম মোকাবিলা করিতে সক্ষম এবং ইহা সদা সহি পথ প্রদর্শন করে।

একের বোঝা অপরে বহন করিবে না, ইহা আল্লাহতায়ালার অমোঘ নিয়ম। (সুরা আল-নজম, ৩৯ আয়াত)। বাইবেলেও ইহাই বলা আছে। (যেহিস্কেল, ১৮:২০)। এক ব্যক্তির রক্তে আর এক ব্যক্তি পার হইবে না। প্রত্যেককে নিজ নিজ স্বর্গ নিজ কার্যের দ্বারা রচনা ও অর্জন করিতে হইবে। উহার সরল সহজ পথ দিয়াছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সাঃ)।

বিশ্বনবী (সাঃ) ও বিশ্বধর্ম ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বিশ্বনবী ও ইসলামকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা লেখা হইল। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আজ জগতের একমাত্র উদ্ধার-কর্তা এবং একমাত্র তাঁহার শিক্ষা আজ জগতের সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে সক্ষম। বস্তুতঃ ইসলাম ব্যতিরেকে অপর কোন ধর্মের পেশ করা খোদা, নবী, ঐশীগ্রন্থ, ভাষা ও শিক্ষা সর্বজনীন এবং সর্বকালোপযোগী নহে।

অতএব হে দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বের অশান্ত মানব মণ্ডলী! আপনারাও শ্রবণ করুন, এবং সম্মানিত নবীকুলের মান্যবর জাতিগণ! আপনাদিগকে আপনাদের সম্মানিত নবীগণ যে মহামানবের আগমনের সুসংবাদ দিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাকে গ্রহণ করার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মানব জাতির বাহ্যিক মিলনের মধ্যে সত্য ও প্রেমের 'রূহ' সঞ্চার করিয়া এই মিলন যুগকে বাহ্যিক ও আত্মিক মহামিলনের যুগে পরিণত করুন। মহামিলন-জনিত জগতের পরিস্থিতি ডাক দিয়া বলিতেছে, হয় মহাজীবন গ্রহণ কর নচেৎ মহামরণ তোমাদের জন্য অপেক্ষমান। আপনারা মহাজীবনের দিকে সত্বর ধাবিত হউন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সহায় হউন।

প্রার্থনা করি, "হে রহমান খোদা! তুমি আদম সন্তান বিশ্ব-মানবের প্রতি করুণা কর, তাহাদের চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় দ্বারকে খুলিয়া দাও, যেন তাহারা তোমার প্রেরিত বিশ্ব কল্যাণকামী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে চিনিয়া ও মানিয়া এক শান্তি ও সুখী অখণ্ড মানবজাতিতে—'উম্মতে ওয়াহেদা'য় পরিণত হইয়া তোমার মহিমান্বিত দরবারে কৃতজ্ঞতায় সমবেত ভাবে সিজদায় মস্তক অবনত করিয়া ধন্য হয়, সার্থক হয়! হে আল্লাহ্! তোমার সৃষ্টির পরিকল্পনা ইহাই, তুমি এই রূপই কর। আমিন!"

সকল প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মরিয়ম পুত্র যীশু

হযরত ঈসা (আঃ)

"ইস্রাইল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকট আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি, ১৫ঃ২৪)

"তিনি ইস্রাইল কুলের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।" (সুরা আলে ইমরান, ৫০ আয়াত)।

—জন্ম উৎসব—

খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে যীশু বলেন। আজ ২৫শে ডিসেম্বর। সারা দুনিয়ার খৃষ্টানগণ যীশুর জন্ম উৎসব করিতেছেন আজকার দিনে। আমরাও তাহাদিগকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

যীশু কে ছিলেন ? তিনি কি খোদা, না খোদার পুত্র, না নবী ? খোদার জন্ম-তারিখ নাই। তিনি চিরঞ্জীব। সুতরাং তাঁহার জন্মোৎসবের কথাও নাই। যীশু খোদার পুত্র হইলে তাঁহার জন্মোৎসব করা খোদার কাজ। তিনি কিছু করেন কিনা কাহারও জানা নাই। অবশ্য তিনি আদেশ দিলে, মানুষ তাহা করিতে বাধ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে খোদার কোন আদেশ নাই। যীশু নবী হইলে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শকে স্মরণ করিয়া উৎসব করা যায়।

যেমন এক ব্যক্তি একই জনের পিতা ও পুত্র হয় না, তেমনি খোদা ও খোদার পুত্র একই জন হইতে পারে না !! অনুরূপভাবে একই জন প্রেরক ও প্রেরিত হয় না। সুতরাং যীশু একাধারে রসুল-প্রেরণকারী খোদা এবং প্রেরিত রসুল হইতে পারে না। অতএব যীশু আল্লাহতায়ালার প্রেরিত নবী।

যীশু কি বেথলেহেমে আজিকার তারিখে শীতের রাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন? লুক বলেন, তাঁহার জন্মের সময় "ঐ অঞ্চলে মেষ-পালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল।" (লুক ২:৮)। যীশুর জন্মস্থান এলাকায় ডিসেম্বর মাসে কঠোর শীতে যমীনে তুষার জমিয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আগষ্ট সেপ্টম্বর মাসে যে সময়ে ঐ এলাকায় গ্রীষ্মকাল হয় এবং খেজুর পাকে, সেই সময়ে যীশুর জন্ম হয়। ঐ সময়ে মেষ-পালকেরা মাঠে মেষ চারণ করে। গবেষকগণ আরও বলিয়াছেন যে, যদিও যীশুর জন্ম-সন-তারিখ সঠিকভাবে বলা যায় না, তথাপি চীনে একটি এঙ্গোরা মন্দির গাত্রে খোদিত শিলালিপি এবং ২৫/২৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে প্রাপ্ত সুসমাচারের হাওয়ালা দিয়া সেখানকার এক বড় লেখকের লেখা হইতে যীশুর জন্ম খ্রীষ্টাব্দপূর্ব অষ্টম বর্ষে হয় বলিয়া জানা যায়। (Uide (1) Bishop Barn's book "Rise of Christianity page 29 (2) Articles on 'Christmus" in (ii) Encyclopaedia

Britanica 15th Ed Vol 5, page 642 and 642A (ii) Chambers Encyclopaedia and (3) Dr. Peaka's Commentary on the Bible, page 227 and 117) বিশপ বার্ণসের হাওয়ালা হইতে দেখা যায় যীশুর জন্মের ৩০০ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম-উৎসব করার জন্য তাঁহার জন্ম-তারিখ মনোনয়ন করা হয় এবং ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লিখিত আছে যে, রোমের অসভ্য জাতিদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগের প্রভাবে তাহাদের সূর্য দেবতার জন্ম উৎসব দিবস বড় দিনকে ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ফাথারগণ আধ্যাত্মিকতার অভিষেক দিয়া যীশুর জন্ম-দিবস হিসাবে গ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআন সত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড এবং ইহা সকল সত্যের দিশা দান করে (সুরা আল-মুমেনুন, ৬৩ আয়াত; সুরা আল-শুরা, ১৮ আয়াত)। যীশুও বলিয়াছেন যে, "সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া তিনি সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন" (যোহন, ১৬:১৩)। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে, মরিয়ম যীশুকে প্রসব করিলে পর ফেরেস্তা তাঁহাকে খেজুর গাছে নাড়া দিয়া তাজা খেজুর পাড়িয়া খাইতে এবং উহার তলদেশ দিয়া প্রবাহমান ঝর্ণার সুশীতল পানি পান করিয়া দেহ-মন চাঙ্গা ও স্নিগ্ধ করিতে বলেন (সুরা মরিয়ম, ২৫-২৬ আয়াত)। এই বর্ণনা ঐতিহাসিকগণের গবেষণা এবং লুক হইতে উদ্ধৃত শ্লোক বর্ণিত বিষয়ের সত্যতা সমর্থন করিতেছে। সুতরাং ২৫শে ডিসেম্বর জন্ম দিন নহে। তাঁহার জন্মসন প্রচলিত

প্রথম খৃষ্টাব্দ নহে, উহার ৮ (আট) বৎসর পূর্বেও নহে। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজিদে নবুয়ত লাভের বয়স ৪০ বৎসর নির্ধারণ করিয়াছেন (সুরা আহ্‌কাফ, ১৬ আয়াত)। সুতরাং তাঁহার জন্ম খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব ১০ম বর্ষে হইয়াছিল। অতএব যীশুর প্রচলিত জন্মসন ও খ্রীষ্টাব্দের গণনাও ভুল। তথাপি খৃষ্টান ভাইদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা অক্ষুন্ন থাকিল।

মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় বহু শিক্ষা লাভ হয়। আসুন, এখন আমরা যীশুর জীবনী আলোচনা করি। দুঃখের বিষয় যীশুর জীবনী, তাঁহার শিক্ষা এবং মূল বাইবেল সংরক্ষিত নাই। বাইবেলেও ইহার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি নাই।

॥ বিনা পিতায় যীশুর জন্ম ॥

ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, যীশু বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণ করেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ইহুদীগণ তাঁহার মাতার নামে কলঙ্ক রটায় এবং খৃষ্টানগণ এই অপবাদ দূর করিতে যীশুকে খোদা ও খোদার পুত্র ইত্যাদি হওয়ার বিশ্বাস রচনা করিয়া প্রচারে রত। দুই জাতির এই দুই প্রান্তিক বিভ্রান্তির মীমাংসা কে করিবে ?

ডাক্তারা বিজ্ঞানের সাক্ষ্য এবং আধুনিক সত্য ঘটনাবলী দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, বিনা পিতায় সতী কুমারীর সন্তান জন্মদান করা প্রাকৃতিক নিয়ম (Perthogenesis) সম্মত কিন্তু যীশুর জন্ম সত্যই যে দুই প্রান্তিক অভিযোগ হইতে পবিত্র এবং তাঁহার জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মে পবিত্রভাবে হইয়াছিল, উহার

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কোথায় ? বিষয়টি এমন নাজুক ও অজ্ঞাতব্য যে, খোদা ছাড়া ইহার প্রকৃত তথ্য কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্য কিরূপে পাওয়া যাইবে ? ইহা কোন নবীর মাধ্যমেই সম্ভব। বস্তুতঃ যীশুর জন্মের পর ৭০০ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য সাক্ষ্য-দাতা কেহ ছিল না।

—ঃ আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষ্য ঃ—

সত্যের সূর্য খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনে মরিয়ম এবং যীশুর মুখমণ্ডল পবিত্রতার আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। তিনি আল্লাহতায়ালার পবিত্র কালাম 'কোরআন মজিদ' আনিয়া জানাইলেন, মরিয়ম মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁহার মাতা (মরিয়ম) খোদাতায়ালার নিকট শয়তানের স্পর্শ হইতে মুক্ত এক সন্তান লাভের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন (সুরা আলে এমরান, ৩৭ আয়াত)। আল্লাহ তায়ালা যে এই দোয়া কবুল করিয়াছিলেন, তাহার তসদীকে তিনি বলিয়াছেন, মরিয়ম স্বীয় সতীত্বের পরম হেফাজতকারিনী ছিলেন (সুরা তাহরীম, ১৩ আয়াত)। মরিয়মের এবাদত এবং সদাচরনে সন্তুষ্ট হইয়া যখন আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তা মারফত তাহাকে সুসংবাদ দেন যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম নামে এক নবী-পুত্র দেওয়া হইবে, (সুরা আলে এমরান, ৪৬ আয়াত), তখন তিনি ইহা শুনিয়া স্বভয়ে বলিলেন, ইহা কিরূপে হইতে

পারে, তাঁহাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং তিনি অসতী নহেন (ঐ ৪৮ ; সুরা মরিয়ম, ২১ আয়াত)। তখন জনগণের এবং মরিয়মের জানা ছিল না যে, বিনা পিতায় স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান জন্মাইতে পারে। ফেরেস্তা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে জানাইলেন, "এভাবেই (কাহারও স্পর্শহীন অবস্থাতেই) আল্লাহর আদেশে (প্রাকৃতিক বিধানে)) তোমার পুত্র লাভ হইবে।" (সুরা আলে এমরান, ৪৮ আয়াত ; সুরা মরিয়ম, ২২ আয়াত)। এবং এই ভাবেই যীশুর জন্ম হইল। সুতরাং আল্লাহতায়ালার সাক্ষ্যে যীশুর জন্ম মূলে কোন মানবীয় বা অমানবীয় বা অশরীরী এজেন্সির কোন আপত্তিজনক স্পর্শ ছিল না। অতঃপর আর কোন সন্দেহ থাকিল না যে, যীশুর জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়াছিল। যীশু বলিয়াছিলেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন। (যোহন, ১৫ঃ১৬)।

ঃ ত্রিত্ববাদ ঃ

প্রচলিত খৃষ্টধর্মে খোদা, পবিত্র আত্মা (জীবরাইল) এবং যীশু তিনজনই খোদা এবং তিনজন এক। তিনে মিলিয়া এক এবং এককে ভাঙ্গিয়া তিন। এ বড় বিচিত্র হিসাব। এককে ভাঙ্গা যায়, ইহা কেহ কখনও শুনে নাই। তিনকে যোগ দিলে এক হয় ইহাও কাহারও জানা নাই। কোন খৃষ্টানের তিন টাকা পাওনা থাকিলে তাহাকে এক টাকা দিলে কি তাহার ঋণ শোধ হইবে ?

ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল, ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। মূল কারণ হইল যীশুর জন্ম সম্বন্ধে ইহুদীদের প্রবল কুৎসার খণ্ডনে সত্য সাক্ষ্যের অভাবে, যীশুর পবিত্র জন্ম বিশ্বাসে বল না পাইয়া, মনকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে ইহা এক কৃত্রিম, অবোধ্য ও অবাস্তব আধ্যাত্মিক প্রহেলিকার অভিনব উদ্ভাবন। এই আজগুবি মতবাদকে দৈহিকভাবে সাব্যস্ত করিতে খোদাতায়ালা সহ পবিত্র আত্মা, মরিয়ম এবং যীশু সকলকেই কলঙ্কিত করিতে হইয়াছে। ধর্মের মুল হইল পবিত্রতা। খোদা, তাঁহার ফেরেস্তা এবং তাঁহার রসুলের মধ্যে যদি সুত্রপাতেই পবিত্রতার অভাব ঘটে, তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রয়োজন থাকে না। এই মতবাদকে খাড়া করিতে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে পাপী করিতে হইয়াছে এবং যীশুকে অভিশপ্ত করিতে হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার 'অভিশপ্ত রক্ত' হইতে পাপের ফ্রি লাইসেন্স বাহির করা হইয়াছে। ফলে ধর্ম, কর্ম ও পবিত্রতার ইতি হইয়াছে এবং পাপের অন্ধকার আজ যমীন ও আসমান ছাইয়া ফেলিয়াছে।

যীশু পুরাতন নিয়মকে বিনা কমি-বেশীতে সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন (মথি ৫:১৭)। পুরাতন নিয়মে এইরূপ মতবাদের কোন নাম-গন্ধও নাই। বহু প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ এবং রদবদল সত্ত্বেও ইঞ্জিলেও কোথাও যীশুর দ্বারা ত্রিত্ববাদ শিক্ষাদানের কথা নাই।

ঃ রুহুল কুদ্দুসের কাজ ঃ

মরিয়মের নিকট যীশুর জন্ম সম্বন্ধে পবিত্রাত্মা গ্যাব্রিয়েলের সু-সংবাদ আনয়নের ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া পরবর্তীতে আলোচ্য মতবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পবিত্রাত্মা গ্যাব্রিয়েলকে ইসলামী ভাষায় রূহুল কুদ্দুস বা জীব্রাইল বলে। জীব্রাইল আল্লাহ-তায়ালার কালাম বা বার্তা বহনকারী ফেরেস্তা। তিনি আল্লাহ-তায়ালার নিকট হইতে নেক বান্দগণের কাছে বিশেষ করিয়া নবীগণের নিকট বাণী বহন করিয়া আনেন। এই বাণী দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের সঞ্চার হয়। যুগ-নবীর উপর তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে যুযোপযোগী শিক্ষার জন্য পূর্ণবাণী লইয়া অবতীর্ণ হন। আল্লাহতায়ালা যাঁহারদের নবীর জনক জননী করেন তাঁহাদিগের নিকটেও তিনি নবীর জন্মের সু-সংবাদ দিয়া জিব্রাইলকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে নবী-পুত্র পালনের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি দেন। ইহা চিরন্তন নিয়ম যে জগত নবীর চরম বিরোধিতা করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা পরিতাপ করিয়া বলি-য়াছেন যে, তিনি এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাহাকে মানুষ হাসি-বিদ্রূপ করে নাই। (সুরা ইয়াসীন, ৩১ আয়াত। নবী সদা একা আসেন এবং অসহায় হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদী গণ জাগতিক সর্বশক্তিতে শক্তিমান থাকে। ধৈর্য, স্থৈর্য সহিষ্ণুতার সহিত পূর্ণ বিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকিয়া নবীর প্রেরিতত্বের

বা রেসালাতের কার্য সম্পাদন করিয়া যাইবার জন্য মহা আত্মিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তিই জীবব্রাইল আত্মায় ফুৎকার করিয়া দেন এবং এই শক্তি আজীবন তাঁহার মাথায় ছায়া দান করিয়া থাকে। যীশুকেও বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল এবং উহার মোকাবেলার জন্য তাঁহার মহা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। পবিত্র আত্মা তাঁহাকে সদা এই শক্তি যোগাইতে থাকেন। লুক ১:৩৫ শ্লোকে মরিয়মের নিকট পবিত্র আত্মার আগমন ও তাঁহার উপর খোদাতায়ালার শক্তির ছায়া করার অর্থ ইহাই। জীব্রাইল কখনও কাহারও জন্য দেহধারী পুত্র বহণ করিয়া অতীতেও আনেন নাই এবং মরিয়মের ক্ষেত্রেও তিনি একাজ করেন নাই। মানুষের পুত্র জন্মাইবার জন্য আল্লাহতায়ালার প্রাকৃতিক নিয়ম রহিয়াছে। ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নবী-রসুল এবং সব মানুষ এই নিয়মেই জন্ম লাভ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্রাত্মা হিসাবে জীব্রাইলের কাজ সদা আল্লাহ-তায়ালার পবিত্র এবং শক্তিশালী কালাম দান করা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করা। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে রুহুল কুদ্দুসের এই কার্য সম্পাদনের কথা লিখিত আছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, আদম যখন পূর্ণ বয়স্ক হইলেন, তখন তিনি তাঁহার মধ্যে স্বীয় আত্মা হইতে ফুৎকার দিলেন এবং ফেরেস্তাগণকে এজন্য সেজদা করিতে বলিলেন (সুরা আল-হিজর, ৩০ আয়াত ; সুরা সাদ, ৭২-৭৩

আয়াত)। ইহা জগত জানে, এই ফুৎকারের ফলে আদমের পেটে কিছু ঘটে নাই। বরং তিনি আল্লাহতায়ালার কালাম ও নবুয়তের অধিকারী হন এবং তাঁহার আরদ্ধ কার্য সম্পাদনের জন্য আত্মার মধ্যে ফুৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা যীশুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ফয়সালা দিয়াছেন যে, তিনি রসুল ব্যতিরকে কিছুই ছিলেন না। (সুরা আল-মায়েদা, ৭-৬ রুকু) এবং কেবল বণি ইসরাইলের জন্য নবী ছিলেন। (সুরা আলে এমরান, ৫০ আয়াত)

আল্লাহতায়ালা আরো সংক্ষেপে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরিচয়কে জগতের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা সর্বত্রই তাঁহাকে মরিয়মের পুত্র যীশু বা মরিয়মের পুত্র মসিহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আখ্যা এতো পরিস্কার যে, ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তিনি খোদা ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না বা কোন নর জাত সন্তানও ছিলেন না। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে একা মরিয়মের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

আল্লাহতায়ালা গণি, সকল অভাব হইতে পবিত্র। তাঁহার বাসনা-কামনা নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কাহারও উপর তিনি নির্ভরশীল নহেন, সকলেই তাঁহার উপর নির্ভরশীল। তিনি কাহারও দ্বারা জাত নহেন ; এবং তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে (সুরা এখলাস)।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যাহারা বলে যীশু খোদা, তাহারা মিথ্যা বলে এবং তাহারা অভিশপ্ত (সুরা তওবা, ৩০ আয়াত) এবং যদি একাধিক খোদা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত (সুরা আল-আম্বিয়া, ২৩ আয়াত)। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে তিনি এ শিক্ষা দেন নাই যে, আল্লাহতায়ালার পুত্র আছে বরং আল্লাহতায়ালার আদেশ অনুযায়ী যে শিক্ষা দিয়াছিলেন উহা হইল—' আল্লাহর উপাসনা কর, যিনি আমার ও তোমার প্রতিপালক প্রভু (সুরা আল-মায়েদা, ১১৭-১১৮)। বাইবেলেও অনুরূপ উক্তি আছে। (মার্ক ১২:২৯-৩০)।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার কোন নবীকে শির্ক শিক্ষা দিতে পাঠান নাই। সকলেই পবিত্র তৌহিদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন (সুরা আম্বিয়া, ২৬ আয়াত)। যীশুও উহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। (মার্ক ১২:২৯-৩০)।

আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রতি এক পুত্র আরোপ করাকে এই রূপ অসন্তুষ্টির চোখে দেখেন যে, তিনি বলিয়াছেন, এইরূপ কথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক ও পৃথিবী চৌচির হইয়া যাউক (সুরা মরিয়ম, ৮৯-৯০ আয়াত)। গুরুতর ভাবনার বিষয় যে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জাতিগণের হস্তদিয়া আল্লাহতায়ালার এই অসন্তোষের সতর্কীকৃত প্রকাশ দিনে দিনে প্রকটতর হইতেছে।

যীশু কি ক্রুশে মারা গিয়াছেন?

অতঃপর প্রশ্ন জাগে যীশুর ক্রুশে মৃত্যুর ব্যাপারটি কি? ইহা যখন সাব্যস্ত যে যীশু খোদার পুত্র ছিলেন না, তখন খোদার পুত্র হিসাবে সারা জগতের পাপীগণের উদ্ধারের জন্য তাঁহার ক্রুশে আত্মদানের প্রয়োজন থাকে না।। নবী হিসাবে এইরূপ আত্মদানের তো প্রশ্নই নাই। ধর্মের ইতিহাসে এই রূপ ব্যবস্থার উদ্ভাবন অভিনব। বাইবেলেও এ ব্যবস্থা নাই। একের বোঝা অপরে বহন করিবে না, ইহাই বাইবেলের শিক্ষা। (যেহিস্কেল ১৮ঃ২০)।

ইহুদীগণ দাউদের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী এক প্রবল প্রতাপান্বিত মসীহের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় সহায়-সম্বলহীন একান্ত দুর্বল এক ব্যক্তি যখন মসীহের দাবী করিলেন তখন তাঁহাকে তাহাদের পছন্দ হইল না। যীশুকে তাহারা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার দাবীকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে রোমীয় গভর্ণর পীলাতের নিকট রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিবার ষড়যন্ত্র করিল। পুরাতন নিয়মে কহ ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মরিলে তাহার অভিশপ্ত মৃত্যু হয় এবং সে চির জাহান্নামী হয়। (দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ঃ২৩)। যেহেতু যীশু পুরাতন নিয়মকে সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার এইরূপ মৃত্যু হইলে অভিশপ্ত মৃত্যু হইবে এবং তাঁহার নবুয়তের দাবী এবং ধর্ম বাতিল হইয়া যাইবে। ইহুদীরা ভাবিল তাহারা ইহাতে

কৃতকার্য হইলে যীশুকে গ্রহণ করার দায় হইতে অব্যহতি পাইবে এবং তাহারা যথেচ্ছা অপকর্ম করিয়া যাইতে পারিবে।

ক্রুশের দণ্ডাদেশে যীশু অভিশপ্ত মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া দণ্ড পূর্ববর্তী সারারাত্রি এই মৃত্যু এড়াইবার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট স্বয়ং দোয়া করেন এবং শিষ্যগণকেও দোয়া করিতে বলেন এবং ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া যখন তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু অবধারিত ভাবিলেন, তখন তিনি শেষবারের মত দোয়া করিলেন "হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! আপনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?" (মথি-২৭ঃ৪৬)। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে নবী করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। যীশু মুর্চ্ছিত অবস্থায় ক্রুশ হইতে নামাইয়া লওয়ার পর তিন দিন নির্জন ভূগর্ভে চিকিৎসাধীন থাকিয়া সুস্থ হইয়া ছদ্মবেশে হিজরত করিয়া যান। এইভাবে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ করেন। কিন্তু যীশুর তৎকালীন শিষ্যেরা এবং তাঁহার পরবর্তী অনুগামীগণ তাঁহার অভিশপ্ত মরণভীতিকে এবং উহার হাত এড়াইবার জন্য তাঁহার অবিরাম দোয়ার দ্বারা প্রচেষ্টাকে কোন মূল্য দেন নাই। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন যীহুদা এস্ক্রাইতিম ৩০ টাকা ঘুষ পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দেয় এবং বাকীরা ক্রুশের ঘটনার পূর্বরাত্রে তাঁহার দ্বারা বার বার দোয়া করিতে আদিষ্ট হওয়া সত্বেও তাহারা ঘুমাইয়া পড়িতে থাকে এবং

নির্বিকারচিত্তে ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়। যীশুর পরবর্তী অনুগামীগণ তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়া ছাড়িল। তাহারা নিজেদের পরিত্রাণের অভিনব প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাস উদ্ভাবনে যীশুর ক্রুশে মৃত্যু এবং তাঁহার তিনদিন জাহান্নাম বাস নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। খ্রীষ্টান জাতি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম জড় বিষয়ের হিসাবে এবং বিচারে এত পারদর্শী অথচ প্রায়শ্চিত্যবাদের মোটা ও যুক্তিহীন বিষয়টা যে তাহাদের চোখে আজও কেন ধরা পড়িতেছেনা, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। তাহারা কেন বুঝিতেছেনা যে, ইহুদীদের হাতকে তাঁহারা মজবুত করিয়া নিজেদের পদতল হইতে ধর্মের পাটাতন সরাইয়া দিয়াছে!

আল্লাহর নবী মৃত্যুকে ভয় করেন না। বালক হযরত ইসমাইল (আঃ)-কেও বধ করিতে নেওয়া হইয়াছিল। তিনি মরিতে ভয় করেন নাই এবং উহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান নাই। অথচ পরিণত বয়স্ক হযরত ঈসা (আঃ) মরিতে কেন ভয় করিলেন ইহা কি চিন্তা করা উচিত নহে? যীশু দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর হইতে ক্রুশে মুর্চ্ছিত হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সারাক্ষণ ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত এড়াইবার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, ইহাই ইঞ্জিলে পরিস্কার ভাষায় লেখা আছে। তিনি পাপীদের উদ্ধারের জন্য বলিদান করিলেন ইহা কোথায় লেখা আছে? আদিম যুগে পূণ্যের জন্য মানুষ বলিদানের বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা আল্লাহতায়ালার অনুমোদিত

ছিল না। তিনি এই প্রথা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানীর ঘটনার মাধ্যমে রহিত করিয়া দেন। ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের অর্থ বলিদান নহে, বরং জীবনের প্রতিমূহূর্ত আল্লাহ্-তায়ালার পথে নিয়োগ করা। হযরর ইসমাইল (আঃ) ও তাঁহার মাতার মক্কায় পরিত্যাক্ত জীবনে কাবাগৃহের সেবায় উহার প্রতিফলন হয়। এই কোরবানীর ফল বিশ্বের উদ্ধার কর্তা সত্যের অত্মা পূণ্যের পরম মূর্তি জগতের অধিপতি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। (যোহন ১৪ঃ৩০-৩১)। যে বলিদানকে বর্বরোচিত বলিয়া আল্লাহতায়ালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, উহা তিনি তাঁহার সম্মানিত নবী যীশুর জন্য কিভাবে পুনঃ প্রবর্তন করিবেন? এই বলিদান যদি তাঁহার অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে হযরত ইসমাইল ও তাঁহার মাতার কুরবানীর অনুরূপ ফল খৃষ্ট জগতের জন্যও ফলিত। যীশুর সম্বন্ধে অপ্রকৃত ও বিকৃত আত্মবলিদানের ফল বিকৃত ও বিষময় হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্যবাদ উদ্ভুত পাপের ফ্রি-লাইসেন্স দ্বারা পবিত্রতা ও পূণ্যের পরিবর্তে জগৎ পাপে ছাইয়া গিয়াছে। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এখনও কি সত্য নিরূপনের সময় আসে নাই?

ত্রিত্ববাদ প্রসূত পাপ ও ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে যে বিকৃত দর্শনের উদ্ভাবনী করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিয়া উহার গুরুত্ব উদ্ঘাটন করিয়া জগতকে দোষী করিবেন। তিনি সত্যের আত্মা সকলকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন (যোহন, ১৬ঃ৭-১৪)।

ক্রুশে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ-তায়ালা প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি জানাই-য়াছেন যে, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। ইহাই সত্য কথা। বাকী যত কথা সকলই অলীক ধারণা। এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই সন্দেহের মধ্যে আছে। কেহই তাহার কথায় নিশ্চিত নহে (সুরা আল-নেছা, ১৫৮ আয়াত)। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তিনি যীশুকে স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বর্গবাসী করিবেন (সুরা আলে-এমরান, ৫৬ আয়াত)। তদনুযায়ী তিনি পরবর্তীকালে কাশ্মীরে মৃত্যুবরণ করেন।

যীশু ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ হন। প্যালেষ্টাইন এলাকায় বণি ইসরাইলের দুইটি গোষ্ঠী ছিল। বাকীগুলি অন্যত্র কাশ্মীর এলাকায় ছিল। ক্রুশের ঘটনায় যখন প্যালেষ্টাইনে তাঁহার কার্য শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি বাকী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাঁহার প্রেরিতত্ব পূর্ণ করিবার জন্য (যোহন ১০ঃ১৬) সেখান হইতে হিজরত করিলেন। প্যালেষ্টাইন হইতে ছদ্মবেশে যখন যীশু পূর্বপ্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী শিষ্যদের সহিত গ্যালিলীতে দেখা করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে জীবিত যীশু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহাদের ধারণা হইয়া-ছিল যে, যীশু ক্রুশে মারা গিয়াছেন। সেইজন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে যীশুর ভূত মনে করিল। তখন যীশু যে জীবিত আছেন, সেই সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য তাঁহার হাতে পেরেক মারার ঘা দেখাইলেন এবং মাছ ও মধু খাইয়া দেখাইলেন।

(লুক ২৪ঃ৩৬-৪০)। ইহাতেও তাহাদের পূর্ণ প্রত্যয় হয় নাই। অতঃপর যীশু যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের জন্য রওয়ানা হইয়া পাহাড় ডিঙ্গাইয়া ওপারে অন্তর্ধান করিলেন তখন তাঁহার শিষ্যেরা দেখিয়া মনে করিলেন যে তিনি আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন। যীশুর জীবিত থাকা সম্বন্ধে অবিশ্বাসী তখনকার শিষ্যেরা ইহাকে যীশুর ভূতের স্বর্গ-গমন মনে করে এবং পরবর্তীকালে যীশুর অনুগামীগণ তাহাদের উদ্ভাবিত প্রায়শ্চিত্ববাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই ঘটনার সাহায্যে তাঁহার জীবিত স্বর্গে যাওয়ার বিশ্বাস রচনা করিয়াছে। সেকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এইসব গল্পে বিশ্বাসী হওয়া অসাধারণ নহে। কিন্তু বর্তমান যুগের আকাশচারী মানুষ কাহারও স্বশরীরে জীবিত বিনা উপযোগী যানবহনে আকাশে বা জীবিত স্বর্গে যাওয়ায় কিভাবে বিশ্বাসী হইতে পারে?

যীশুর তিন বয়সের মৃত্যু?

যীশু যে অল্প বয়সে মারা যান নাই, তাহার প্রমাণ ইনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় যীশুর যৌবন, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বয়সের তিনটি পেইনটিং (ছবি) দেখুন। ("Encyclopaedia Britanica Edn 14. Vol 13, under the article Jesus Chrirst")। ইহার তসদিকে দেখুন পবিত্র কোরআনে আছে—'যীশু যেমন অল্প বয়সে কথা বলিতেন, তেমনি বেশী

বয়সেও কথা বলিতেন। (সুরা মায়েদা, ১১১ আয়াত)। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জীব্রাইলের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া বলিয়াছেন যে যীশু (ঈসা) ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। (মুওয়াহেবে ল্লাদুন্নিয়া, জালালাইন ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস)। বস্তুতঃ যীশু কাশ্মীর এলাকায় বণি ইসরাইলগণের মধ্যে স্বীয় প্রেরিতত্বের কার্যকে সম্পাদন করিয়া কাশ্মীরে মারা যান এবং সেইখানেই সমাধিস্থ হন। ইহার সত্যতা আজ ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত।

কাহারো জন্য জীবিত স্বর্গে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই স্বর্গের পথ নির্দিষ্ট। তেমনি স্বর্গে যাইয়া কাহারও সেখান হইতে ফিরিবারও ব্যবস্থা নাই এবং একাধীক বার কাহারও মৃত্যু হয় না এবং স্বর্গবাসীদের জন্যও এ নিময়ই বলবৎ (সুরা দুখান, ৫২-৫৭ আয়াত)। সুতরাং যীশু চির-কালের জন্যই স্বর্গে গিয়াছেন।

আরো একটি পরম আশ্চার্যের বিষয় যে যীশু বণি ইসরাইলের হারাণো মেষ ছাড়া আর কাহারো জন্য আসেন নাই। যাঁহারা বণি ইসরাইল নহেন তাঁহাদের জন্য তিনি কোন কল্যাণ আনেন নাই অথচ জগৎ জোড়া খৃষ্টান কোথা হইতে আসি-য়াছেন? যে সকল খ্রীষ্টান ভাই বণি ইসরাইল বংশের নহেন আজ যীশুর জন্ম উৎসব দিনে তাঁহাদের এই কথা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন যে, তাঁহাদিগকে কে কল্যাণ দিবে?

দেখা গেল যীশুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, অবস্থা ও শিক্ষাকে যে সকল অপ্রকৃত, অমর্যাদাকর ও অসত্য কিস্‌সা-কাহিনীর আবরণ দ্বারা লোক চক্ষু হইতে অন্তরাল করা হইয়াছিল, পবিত্র কোরআনে উহাদেরকে বিদূরীত করিয়া যীশুর সত্য ও যথাযথ মর্যাদাকর স্বরূপকে খুলিয়া দিয়েছে।

ঃ সত্যের আত্মা মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ

যীশু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর 'সত্যের আত্মা' আসিবেন এবং তিনি সকলকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন এবং তিনিই তাহাদের সহিত চিরকাল থাকিবেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন (যোহন ১৪ঃ১৭)। যীশু আরো বলিয়াছেন, "যে তাঁহাকে প্রেম করে সে তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করিবে। তাহা হইলেই খোদা তাহাকে প্রেম করিবেন" (যোহন ১৪ঃ২১)। এই প্রসঙ্গে যীশু যাঁহার শরীয়তকে সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন সেই মোজেসের (মুসা আঃ-এর) আদেশও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—"আমি উহাদের জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা

যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণ পাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহা বলে কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ঃ১৮)।

হে বিশ্বের খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণ! আজিকার দিনে এই শুভ সংবাদ দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মোজেস এবং যীশু প্রতিশ্রুত সেই নবী (যোহন ১ঃ ২১) এবং সত্যের আত্মা এবং জগতের অধিপতি। আজি যীশুর জন্ম উৎসব দিনে মোজেস ও যীশুর উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশবাণী আপনাদের খেদমতে উপহার স্বরূপ পেশ করিতেছি এবং প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করিয়া চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করিবার জন্য সাদর ও প্রেমপূর্ণ আহ্বান জানাইতেছি। আমরা প্রার্থনা করিতেছি আপনাদের উৎসব দিনে আল্লাহতায়ালা আপনাদের হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করিয়া দিন এবং আপনাদিগকে রুহুল কুদ্দুসের সহায়তায় সত্য ও কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য দিন। আল্লাহ তাহাই করুন (আমিন)।

()-(ঃ-ঃ)-()

হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"এক নূতন আকাশ এবং এক নূতন জগত দেখা দিবে। সে দিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভ করিবে। তাহার পর অনুতাপের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আগ্রহের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। কেবল তাহারাই বাহিরে থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয় প্রকৃতির দ্বারা মোহরকৃত হইবে; যাহারা আলো ভালবাসে না, পরন্তু অন্ধকার ভালবাসে। ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে এবং সকল অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র যাহা না ভাঙ্গিবে, না ভোতা হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি তৌহীদ, যাহা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ-মরুবাসীগণও তাহাদিগের অন্তরে অনুভব করে, চরাচরে ছড়াইয়া পড়িবে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্য অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকিবে না। স্বর্গীয় হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কুচক্রকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু তরবারী বা বন্দুকের সাহায্যে নহে; পরন্তু কতকগুলি আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করিয়া এবং কতকগুলি পবিত্র হৃদয়কে স্বর্গীয় দীপ্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া। কেবল সেই সময়েই তোমরা বুঝিবে যাহা আমি বলিতেছি। (তবলীগে রেসালাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮-৯ পৃঃ)

রসুল (দঃ)-প্রেমে

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সকল বরকত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম হইতে। [ইলহাম—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)]

*　　*　　*

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
অমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন]

*　　*　　*

তোমাকে দেখিয়া আলোকের অপূর্ব বিকাশ দেখিয়াছি।
তোমার নূর দিয়া আমি শয়তানকে পুড়াইয়াছি॥
হে শ্রেষ্ঠ নবী! তোমারই জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াছি।
তোমার অগ্রগমনে আমরা কদম আগে বাড়াইয়াছি॥
আদম-সন্তান কি বস্তু, সকল ফেরেস্তা তোমার মহিমায়
সেই গীতি গাহে, যাহা আমি গাহিয়াছি॥ [উর্দু দুরের সমীন]

*　　*　　*

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ)-এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান॥

*　　*　　*

যদি সেই প্রিয়ের [মোহাম্মদ (সাঃ)-এর] গলিতে তলওয়ার চলে
তবে আমি প্রথম ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম প্রাণ দান করিবে॥
[ফারসী দুররে সমীন]

খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ -এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের ॥
[ফারসী দুররে সমীন]

* * *

স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায় এরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। [কিশতিয়ে নুহ]

* * *

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্ত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ॥
[ফারসী দুররে সমীন]

* * *